"স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।"

নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা] [পৌষ, ১৩

মিলন।

[শ্রীনলিনীকান্ত সরকার।]

(গান)

আমি শুধু তোমায় চাই।
লোকের কথা শুন্‌তে গেলে
দিন যে আমার ফুরিয়ে যায়।

ডরবো না আর অপবাদে,
পড়্‌বো না আর অবসাদে,
ধরার বোঝা বইবো মাথে
তা'তে কোন দুঃখ নাই।

আসে যদি ঝঞ্ঝা-বারি
মহাপ্রলয় ঘিরে,
(আমি) শান্ত সৌম্য গিরির মত
পেতে নিব শিরে ;

আপন মনে আপনা হ'তে
বইবে সে যে সুধা-স্রোতে,
মিশবে সুখে স্রোতস্বিনী
সাগর-বঁধুর নীলিমায়।

তুমি আমায় রাখ্‌বে বেঁধে
তোমার আলিঙ্গনে,
আমি তোমায় মিশিয়ে নিব
দেহ, প্রাণ ও মনে;

তোমার আমার এ সংযোগে,
মগ্ন রব মহান্ ভোগে,
এ প্রেম মোরা সবার মাঝে
বিলিয়ে দিব বসুধায়।

চক্রে দেশ বাঁচবে।

[শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ।]

এ সংসারে আমরা সব ভেঙে ভেঙে ভাগ করে নিয়ে ঘর করছি। এই আমার বাড়ী, ঐ তোমার ঘর; এই আমার গাঁ, ঐ তোমার সহর; এই আমাদের দেশ আমাদের জাত আমাদের ধারা, ঐ তোমাদের মুল্লুক তোমাদের আচার বিচার, তোমাদের সভ্যতা। ভাগাভাগি ঘর কন্না না হলে মানুষেয় সুবিধা হয় না; তার কারণ মানুষের বুদ্ধি অল্প, সবটা এক সঙ্গে ধরতে পারে না, ধরতে গেলেও কোনটাই বুকের ধন করে সার্থক প্রেমে ধরা হয় না। আমাদের স্নেহ প্রেম দরদ, মমত্ব একটু খানি; বৌটি ছেলেপুলে কয়টি আর মা বোনকে পেলে সবটা হৃদয় ঢেলে দিয়ে তাদের আশার ভাণ্ড ভরে দিতে পারি, সেবায় তাদের মর্ম্মছেঁড়া রকমের আপন করে নিতে পারি। কিন্তু দেশ সুদ্ধ জগৎ সুদ্ধ সবাইকে তেমন পারি না।

তাজ মহলের কারু—সেই শ্বেত পাথরের গায়ে মতি চুণীর আলপনা জল্পনা শিল্পমাধুরী ধরতে গেলে আমাদের বুদ্ধি সে অসীমকে ভাগ করে করে দেখে; এখানে একটি খিলান, ওখানে একটি চবুতারা, সেখানে একটুখানি মর্ম্মরের মিহি জাল বুনানী—এই করে দেখে দেখে আমরা সব তাজটা বুঝি। আনন্দে—নিথর সুখে জুড়িয়ে যাই সবটাকে বুঝে ও আস্বাদ করে বটে, কিন্তু এই অসীমকে বুঝার

রকমটা হলো টুকরো টাকরা ধরে অল্পে অল্পে চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে। ভগবান নিজেকে এ লীলার মাঝে দেখাচ্ছেন এমনি করে লীলার ফুলঝুরি তুলে, ফিন্‌কির মাঝ দিয়ে, একটু আধটু পথ ভোলা মাধুরীর অলখ জাগিয়ে। এই হ'লো জীবনের ধারা।

আমাদের দেখ চোখ নাক কাণ আঙ্গুল জিব এই রকম বোঝবার জানবার দেখবার আস্বাদ নেবার সব ইন্দ্রিয় গুলিই এক এক চুমুকে একটু খানি পায়। জিব দিয়ে রসগোল্লা পানতোয়া খাই, এক একটা করে, তা' আবার ভেঙে ভেঙে চিবিয়ে চিবিয়ে জিবের ওপর উল্টে পাল্টে; একটু একটু খাই আর আনন্দের ধারা চলে। চোখ মেলে আগে আমি দেখি রূপসীর চাঁপালী নবনীত রূপের স্বপ্ন, তার পর দৃষ্টি তুলে চেয়ে দেখি ঢেউয়ে ঢেউয়ে অঙ্গঢাকা কালো চুল, তারপর চোখের আয়ত লাজমন্থর কালো তল, বিম্ব অধরের ধনুবঙ্কিম রেখা আর কাঁপা সরসতা, শেষে চোখ তুলে নামিয়ে ঘুরে ফিরে বরাঙ্গের সুঠাম ভঙ্গী কত করেই না দেখি, তবে তো আমার এ চিরসুন্দরের মাঝে জাগা সমাধি শেষ হয়।

সংসারে আমাদের জীবনে এইরূপে এককে পাই ভেদে আর ভেদকে পাই একে। এখানে সসীমে অসীমে জড়াজড়ি, পশুতে দেবতায় মাখামাখি,—ভেদ ফোটাচ্ছে অভেদকে, অভেদ ধরে আছে ভেদকে। যে এই দু'টোকে বোঝে সেই বোঝার মত বোঝে, জানার মত জানে, দেখার মত দেখে। যখনই আমরা একটাকে আত্যন্তিক করে ধরি, তখনি জীবন বেসুরো বাজে, তাল কেটে যায়। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে আছে ইন্দ্রের সভায় নাচতে নাচতে অম্বুবতী নটীর তাল কেটে গেছিল, সেই দোষে তাকে রঞ্জাবতী হয়ে মর্ত্ত্যে জন্ম নিতে হ'লো। আমাদেরও জীবনের সমাজের বা জাতীয় ধারার তাল কেটে গেলে স্বর্গচ্যুতি ঘটে, সে মানুষ সমাজ বা সে জাতি সেই দিন থেকে তিল তিল করে মরতে থাকে।

কিছুকাল থেকে ইউরোপ আর এসিয়ার এমনি করে জীবন নৃত্যে তাল কেটে গেছিল। ইউরোপ জীবনকে ধরেছিল মাতালের মত আঁকড়ে; সুখ বিলাস জ্ঞান কাজ ছুটাছুটি হুটোপাটি ছাড়া আর কিছু সে জানতো না, ঐটেকেই সাত কাহন ভাবতো। তার ফলে দুনিয়া ভরে অভিশাপ উঠেছে, মড়ার মাথায় মাথায় পাহাড় হয়ে গেছে পরের ঘরে ডাকাতী রাহাজানী করে করে এখন যদুবংশ ধ্বংস হবার যোগাড়। মানুষ নিজের গর্ত্তে যে নিজে পড়ে, পাপের করাত যে আসতে যেতে কাটে, তার দৃষ্টান্ত আজ ভোগপাগল ইউরোপের ঘরে দেখে নিও।

এসিয়া অন্তরকে ধরেছিল ঠিক অমনি চোরের পুঁটলীর মত জড়িয়ে, তাই

এসিয়ার এতদিনকার ছবি হ'লো ধ্যানে মগ্ন মৌনী যতি আর তার মাথায় এক জোড়া বিদেশী নাগরা। আমরা দুনিয়া-ছাড়া কি এক উদ্ভুট্টি আত্মাকে খুঁজতে গিয়ে ইতোভ্রষ্ট-স্ততো নষ্ট হয়েছি, অরূপকে ধরতে গিয়ে রূপ অরূপের পরম ধনকে হারিয়েছি। যার বসবার ঠাঁই নেই, সে ধ্যান করবে কোথায়? এপারে পাটনীর নৌকায় উঠবার ঘাট যার নেই, সে ওপারে যাত্রা করবে কোন ঘাটে তার পণ্য তরণী সাজিয়ে? এ দিন-দুনিয়ার লীলারাজের দেবসভায় এসিয়া ও ইউরোপ—দুই নর্ত্তকীরই নাচের তাল কেটে গেছে, তাই বৈকুণ্ঠ আর ধরার যাতায়াতের পথ আজ বন্ধ, তাই বিশ্ব মানবের আজ এ স্বর্গচ্যুতি। তাই আজ ইউরোপ ভক্ষক আর এসিয়া ভক্ষ্য,—একজন বাঘ আর একজন হরিণ;—দুই-ই পশু।

এই সঙ্কটের দিনে হা-ভাতের যুগে জীবনের তাল লয় ছন্দ ফিরিয়ে আনতে হবে, বাঁশীর সাতটা রন্ধ্রে আঙ্গুল দিয়ে সুরসপ্তকে ভরা রাগিণী বাজাতে হবে। আমরা খেতে পাচ্ছিনে, সুতরাং মার্ মার্ মার্, কেড়ে খা' কেড়ে খা'—এ হলো পুরোণো স্বার্থবাদী ইউরোপের পশুর কথা। কেড়ে নেওয়ার দু'টো দিক আছে, কাড়া-কাড়ি; মারবার দু'টো দিক আছে, মারা-মারি; এক হাতে তালি বাজে না, খুন করতে গেলে খুনোখুনী হয়ে যায়। ইউরোপে এসে আমাদের দেশ কেড়ে নিয়ে ঐ পশুর যুক্তি আমাদের চূড়ান্ত করে বুঝিয়ে দিয়েছে, ঐখানে ঐ বোঝার মাঝে আমরা সত্যি সত্যিই হেরে গেছি—পরাধীন হয়েছি। যে জাতির ভাব-দেহ ঘুচে আত্মঘাত ঘটেছে সেই পরাধীন। আমরা ভাবছিলুম দুনিয়ার ভেল্কি কাটিয়ে উঠে মনের পারে নির্ব্বাণের সুখ-ফোয়ারা পাব, তাই ভগবান জুতিয়ে ধ্যান ভাঙিয়ে দিলেন। সেই ত ছিল একটা মস্ত বিরাট ভুল! এখন আবার যদি ইউরোপের দেখাদেখি ভোগের কসাইখানায় ঢুকি, মেরে লুটে পুটে জীবনের হাটে গুণ্ডাবাজী করে মানুষ হতে চাই, তা' হ'লে ত আবার যুগযুগান্ত ধরে ওদের ভুলই মক্সো করতে হ'বে, অন্ন নিয়ে কাড়াকাড়ির অবিরাম হয়রাণীতে অন্ন পেটে দেওয়া আর হয়ে উঠবে না।

তোমার সামনে তোমার বুক থেকে ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে যদি কেউ কেটে ফেলে, সে পশুবৃত্তি কি করুণ আর বীভৎস হয়ে বাজে। আর ঠিক ঐ কাজ একটা নয় অগুন্তি হাজার ঐ খুন দেশের নামে করে যখন বীর জয়ী হয়ে ফেরে, তখন সে পরদেশদ্রোহীর নগরে নগরে আনন্দ উৎসব পড়ে যায়! মানুষ যে কি সঙ তা' এইখানে বেশ বোঝা যায়। ন্যাশনালিটিও মাত্রা হারালে অতিবড় জঘন্য পাপে গিয়ে দাঁড়ায়; তখন সে ন্যাশনালিটি বা দেশপ্রেমের নাম হয়

ইম্পিরিয়ালিজম্ বা রাষ্ট্রগৌরবের নেশা। এই নাশেনালিজম্ বা জাতীয়তার গুণ্ডাগিরিতে সমস্ত জগৎ আজ খুনে লালে লাল, কত শত হল্‌দিঘাট কুরুক্ষেত্রে অশিবারূপ শ্মশান-নৃত্যে নাচছে। ইহসর্ব্বস্ব আর ইহ বিমুখ এই দুই তাল-কাটা সভ্যতায় আজ জগতের অর্দ্ধেক মানুষ নবাব আর অর্দ্ধেক গোলাম; গোলামী করতে করতে মানুষ যেমন পশুর অধম হয়, প্রভু হয়ে গোলাম চরাতে চরাতেও মানব-দ্রোহের পাপে বিজেতারও তেমনি ইহ জন্মেই রাক্ষস-গণ প্রাপ্তি হয়।

আজ এই নতুন যুগের যুগ-উষায় ইহবিমুখ ভারত বুঝেছে যে নর ও নারায়ণ এক, দেউল বিনা দেবতা সাজে না, জগতের শ্রীঅঙ্গনে রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে শব্দে অরূপ নিরঞ্জনের সহজ পূজা দিবানিশিই চলছে। ভোগকে ছাড়লে ত্যাগের দেবতাকে প্রতিমাহারা করা হয়, নর-নারায়ণের সেবাই আনন্দঘনের পথ। ব্যক্তিবাদী (Individualistic) ইউরোপও আজ সঙ্ঘজীবন সার করেছে, তারাও বুঝেছে সোণার খাঁচা নিয়ে কাড়াকাড়িই এতদিন সার হয়েছে। খাঁচার পাখী—সেই অরূপের ধন কখন যে সোণার খাঁচা ছেড়ে নীল আকাশে হারিয়ে গেছে তা' টের পাওয়া যায় নি। ফলে সহর নগর জনপদ ভরে ইমারত উঠেছে, আলোর মালায় ভোগের শোভাযাত্রা সে নগরপথে নিত্যই বাদ্য কলরবে চলেছে; কিন্তু নগরে নগর-লক্ষ্মীর আবির্ভাব নেই, এ যেন সুখের দুঃস্বপ্ন, শুধু দেহের দোকানদারী।

এতদিন ইউরোপে ব্যক্তিবাদ প্রবল ছিল, স্বামী তার দাবী কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিচ্ছিল; স্ত্রী তার পুঁটলী আলাদা বেঁধে নিজের ঘরে তুলছিল; প্রজা তার সত্ত্ব দলীল অধিকার নিয়ে রাজার সঙ্গে হাঁক ডাক ঠেলাঠেলি করছিল। তারপর এলো ধনীদের আলাদা পঞ্চায়েত, ব্যবসায়ী দোকানদারের আলাদা পঞ্চায়েত, মজুরের আলাদা পঞ্চায়েত, নারীর আলাদা পঞ্চায়েত, কয়লার খনির কুলি, জাহাজের খালাসী, মোট বাহী, রেলের চাকর সবারই পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে ধুল পরিমাণ। ঐখানে ব্যক্তি গিয়ে সঙ্ঘজীবনের সুরু হল; কিন্তু তলিয়ে দেখো তখনও তার মধ্যে ব্যক্তির দাবী রয়েছে; তবে একা একা লড়া যায় না বলে জাতে জাতে পেষায় পেষায় থাকে থাকে সব আলাদা হয়ে দল বেঁধে নিজের নিজের পাওনা গণ্ডা আদায় করবার জন্যেই এই সঙ্ঘ। তাই সেখানে ধনের সঙ্ঘের সঙ্গে মজুরীর লড়াই, কয়লার ধর্ম্মঘট ব্যবসাদারের সঙ্ঘ ভেঙ্গে দেয়। এখনও দেখো ইউরোপে ঠিক পঞ্চায়েত গড়ে নি, কারণ পঞ্চায়েত মানেই যে পাঁচজনের স্বার্থ

দেখে ও পাঁচের হিতে কাজ করে। সঙ্ঘ যদি শুধু যত গাড়োয়ান আছে তাদের স্বার্থ দেখলো, তা' হলে ত এক জনেরই স্বার্থ দেখা হলো, শুধু কামার বা শুধু ছুতারের স্বার্থ নিয়ে মারপিট করলে যে নাপিত ধোপা চাষা পুরোহিত প্রভৃতি কত জনার স্বার্থ অবহেলা করা হলো। জীবনটা যদি শুধু কামারের হাপর নিয়ে চলতো তা' হলে ত ভাবনা ছিল না; কিন্তু কামারকে যে দু'সন্ধ্যা ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে হয়, জোলার কাপড় না নিলে তার লজ্জা নিবারণ করে কে? জাতির জীবন মানেই তাই, সেই জীবনের শতমুখী স্বার্থ যে পঞ্চায়েতে বজায় রাখে, তারই নাম পঞ্চায়েত বা সঙ্ঘ বা চক্র। এই চক্রের চক্রেশ্বরই রাজা বা দেশপতি। এই চক্র দিয়ে অনন্ত জীবনকে ভেঙে ভেঙে ভেদের মধ্যে আস্বাদ করা যায়।

এই চক্র বিরাট বিশাল জিনিস, এর আদি অন্ত আছে কিনা সন্দেহ। দেখছো না মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা হর-রঙা কামনা বাসনার হিসেব কিতেব নেই, মানুষ যে—"মৃদুল কাম তরঙ্গ-মোহন নীলাম্বুধি"।

এই কামনা বা প্রেরণার ঢেউ-দোলা সাগর—মানুষের জীবন এই পৃথিবী ধরে ধরে ভূমায় গিয়ে ঠেকেছে—তারই নাম সংসার-বট, এই জীবন-তরুর কথাতেই গীতা বলেছেন—"ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্"।

গাছটা উল্টো, গোড়া এর ওপর দিকে আর ডাল পালা নীচে। তা' তো হবেই,—গোড়া যে ভগবানে, বৈকুণ্ঠে; আর ডাল পালা—শতমুখী সকল প্রকাশটা তার দুনিয়া-জোড়া। তা' হ'লেই দেখ সেই সঙ্ঘ সেই চক্র ঠিক, যা' এই জীবন-বটের ডালে ডালে পাতায় পাতায় রস আলো সার মাৎ জোগায়। দেশ জুড়ে চক্র গড়, সে চক্রে মুদি মাল্লা কুমোর ছুতোর যোগী ভোগী রাজা প্রজা সব যেন যে যার আঙিনায় সুখে থাকে আর এই চক্র-দেবতার নাটমন্দিরে সবাই সবাইকে খুঁজে পায়। সেখানে মাংসের ভার কাঁধে কসাই শঙ্করাচার্য্যকে সোঽহং তত্ত্ব শেখায়, সেই চক্রেই ত রুহিদাস জুতো বানায়, নানক দোকান করে, চণ্ডীদাস রজকীর পায়ে বিশ্ব মাতাকে জগৎ-রাধাকে কুড়িয়ে পায়। চক্র গড়, চক্র গড়, দেশময় চক্র গড়, পরম বাঁধনে মনের ডোরে প্রেমের রাসে এক হও, নইলে দুর্ভিক্ষ মহাহারী ভয় লজ্জা তোমরা একা একা ঘুচাতে পারবে না।

ঋষির সাধ

[শ্রীরামদর্শনে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষির উক্তি]

(শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী)

(আমরা) চাইগো তোমারে চাই;
সাধ মিটাইয়ে সারা দেহ দিয়ে
লুটিতে তোমারে চাই!
শতবাধা শত বিপদ, বিবাদ,
ভূষণ করিয়ে গুরু পরিবাদ,
চির সাথী করে' বিরহ বিষাদ,
যেন, মিলনের মধু খাই,
সারা দেহ, সারা পরাণটী দিয়ে
তোমারেই যেন পাই।
চিদ আনন্দ — ঘন রূপে, রসে,
সাধ নাই, সাধ নাই!
যেন, আমার আমার বলিয়া তোমারে
কামনার (ই) জয় গাই!
সংশয়ে ঘন কণ্টক বনে
তুমি হেসে যেও নিতি নিজ মনে,
ক্ষুধিত তৃষিত কাতর পরাণে
মোরা র'ব পথ চাই,'
মনসিজমোহ, মধুর মুরতি,
কখন্ দেখিতে পাই!
যেন, দিগন্ত ঘেরা অন্ধকারের
সকল রন্ধ্র ছেয়ে,
তব সঙ্কেত নিঃস্বন উঠে
আহ্বান গান গেয়ে!

ও রাঙ্গা চরণে জাতি কুল মান
অঞ্জলি ভরে' করে ফেলি' দান,
যুগান্ত ধরে' বাঁচি যেন মরে
অনন্ত দুখ পেয়ে,
তুমি যে আমারি এই আনন্দে—
র'ব আশাপথ চেয়ে!
হৃদি তীর্থের পূত স্নেহ-নীরে
অভিষেক হ'বে কভু,
কিঙ্করী হ'য়ে সেবিব কখনো
তোমারে করিয়া প্রভু!
মা হ'য়ে বাড়াব' বক্ষ রুধিরে,
কেহ অভিমানে নয়নের নীরে,
তোমারে ভাসা'য়ে পিয়াময় হ'য়ে
আপনি ভাসিব তবু;
হৃদি তীর্থের পুণ্য উদকে
অভিষেক হ'বে কভু!
সকল ছন্দ সকল বন্ধ,
খুলিবে ব্যথার গীতে,
পলকে পলকে নব নব সাধ
জাগিবে সে লীলাটীতে!
নারী হৃদয়ের নবীন দৃশ্য,
চমকি চাহিয়া দেখিবে বিশ্ব,
নত হ'বে কত উদ্ধত শির
(সেই) পাবন তীর্থ টীতে,
চাই গো তোমারে নবীন লীলায়
ব্যাকুল নারীর চিতে!

কেরাণীবাবু।

[অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার সরকার এম এ]

শিয়ালদহ ষ্টেশনের কাছে আসিয়া অতুলচন্দ্রের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে বুড়ির জন্য বেদানা লওয়া হয় নাই তো। তাড়াতাড়ি বৈঠকখানার বাজারে বেদানা কিনিতে ছুটিলেন যা' দর বলিল সঙ্গে যে পয়সা আছে—তাতে একটার দামও হয়না। মৃত্যুশয্যায় শায়িত কন্যার শেষ ইচ্ছা বুঝি পিতা আর পূর্ণ করিতে পারিলেন না! তাড়াতাড়ি অফিস ছাড়িয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ঔষধপত্র সবই লইয়াছিলেন—কেবল আসল কথাটাই ভুল হইয়া গেল! এ দিকে ৫-৩৮ এর গাড়ী তো চলিয়া গেল! ভাবিলেন—"একবার বড় বাজারের দিকে যাই যদি একটু সস্তায় পাওয়া যায়। কিন্তু অতটা দেরী করিয়া বাড়ী পৌঁছিলে মায়ের আমার খাওয়ার অবস্থা থাকিবে কি?" সাত পাঁচ ভাবিয়া অতুলচন্দ্র এক প্রকার ছুটিতে ছুটিতেই—বড়বাজারের দিকে চলিলেন—অল্প দামে বেদানা পাওয়া গেল—পকেটে লইয়া আবার ছুটিতে ছুটিতে শিয়ালদহ আসিয়া গাড়ী ধরিলেন।

(২)

"বুড়ী, কেমন আছিস্ মা, এই আমি তোর জন্যে বেদানা এনেছি, রস ক'রে দিই একটুখানি মুখে দে মা।" বুড়ীর তখন শেষ অবস্থা, কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। রস মুখে দেওয়া হইল; পিতার দিকে সাশ্রুনয়নে চাহিয়া, তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া, নিজের দশম বর্ষীয়া কন্যা উমাকে পিতার হাতে সমর্পণ করিয়া বুড়ী চিরদিনের মত অতুলের সংসার ছাড়িয়া চলিল। অতুলের গৃহলক্ষ্মী ইহ সংসার ত্যাগ করিবার পর হইতে তাঁহার এই বিধবা কন্যাটিই সংসার বজায় রাখিয়াছিল। যক্ষ্মা রোগে সেও আজ যমের সদনে চলিয়া গেল!

(৩)

বুড়ী তো গেল! বিজয়ের বিবাহ দিয়া একটি বৌ আনিতে পারিলে সংসারটা চলিতে পারে। তাহার বিবাহে কিছু টাকা পাইলে সেই টাকায় উমার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সামনেই বিজয়ের পরীক্ষা, প্রত্যেক পরীক্ষায় সে বৃত্তি পাইয়া আসিয়াছে বলিয়া অতুলচন্দ্রকে তাহার পড়ার খরচের জন্য ভাবিতে হয় নাই—উপরন্তু ছেলে পড়াইয়া টাকা আনিয়া সে সংসারে সাহায্য করিয়াছে।

বি, এ, টা ভাল করিয়া পাশ করিতে হইবে—তাই পিতা তাহাকে ছেলে পড়াইতে নিষেধ করিয়া ছিলেন। কাল ফিএর টাকা চাই—বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে – এক সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা কোথায় পাওয়া যায়! পিতা পুত্রে এই ভাবনাতেই বিষণ্ণ হইয়া আছেন।

(৪)

বেলা ১০ টা বাজিয়া গিয়াছে—টাকা কোথাও যোগাড় হইল না। অতুল আসিয়া বিজয়কে বলিলেন "বাবা, টাকা তো পাওয়া গেল না, ভগবান্ আমাকে সব দিক দিয়েই মেরেছেন। তোমার মা স্বর্গে গিয়ে বেঁচেছেন। ঘরে চাল কম পড়িলে তার মাথা ধরত, না হয় তো পেটের অসুখ হত এই ক'রে সে নিজের গ্রাস তোদের দিয়ে তোদের মানুষ করে গিয়েছে; অসুখের উপর হাড় ভাঙা খাটুনি খেটে ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে সে তোদের সেবা ক'রে গিয়েছে; সেই সতীলক্ষ্মী অনাহারে অনিদ্রায় অত্যাচারে তিলে তিলে মারা গিয়েছে। তার দেওয়া শেষ স্মৃতি একটা আঙ্‌টি আছে, সেইটা বেচে যদি টাকা আনতে পারি, দেখি।"

(৫)

বিজয় বলিল—"বাবা তা কিছুতেই হবে না, আমার পরীক্ষা দেওয়া না হোক সেও ভাল, কিন্তু মায়ের সেই স্মৃতিটা গেলে বড় কষ্ট হবে, ঘটি বাটি বাড়ী ঘর সবই তো গিয়েছে—এখন ভালবাসার স্মৃতিটুকু বিক্রী ক'রে সব ঘুচাতে চাই না। আমি ঠিক করেছি—বিলাসপুরের মঠে গিয়ে মিশনে যোগ দিয়ে সন্ন্যাসী হব—বাবা, আপনি অনুমতি দিন্।"

(৬)

অতুলচন্দ্র ছেলের কথায় সুখও পাইলেন, দুঃখিতও হইলেন। কি করিবেন, ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া বলিলেন—"তাই যা বাবা, গৃহী হ'য়ে যে সুখ তোদের দিতে পেরেছি, তাতে আর কাকেও গৃহী হতে বলিনে। যা সেখানে গেলে, দুবেলা দুটো ভাল করেই খেতে পাবি, ভাতকাপড়ের অভাব কোনোদিনই হবে না। লোকে "মহারাজ" বলে সম্মান করবে, পায়ের ধুলো রাজাতেও মাথায় নেবে, তবে বাবা বি, এ, টা পাশ ক'রে সেখানে গেলে বোধ হয় তারাও তোকে বেশী খাতির করতো, লোকেও বেশী মানতো। চাই কি পরে তোর আমেরিকা বা বিলাত যাওয়াও ঘটতে পারতো। না:—ঐ আংটিটাই বেচে তোর টাকা আমি এনে দিচ্ছি।"

(৭)

স্যাকরার দোকানে গিয়ে সেই আঙটিটা দর করিতে করিতে অতুলের চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল পড়িল। নীলু স্বর্ণকার অতুলের বাল্যবন্ধু এবং প্রতিবেশী। সে এই আঙটির কথা জানিত। অতুলের চোখের জল তাহার চোখ এড়াইল না। সে বলিল—আমি তোমায় পঞ্চাশ টাকা ধার দিচ্ছি,—তুমি ভাই আংটি ফেরৎ নিয়ে যাও, ছেলে পাশ ক'রে রোজগার করলে শোধ দিও।" অতুলের চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল—সে বলিল, ভাই নীলু, তুমিই আমার বন্ধুর কাজ করলে, আংটিটা তোমার কাছেই থাক, যখন টাকা দেবো ফেরৎ দিও—জান তো আমাদের অভাবের সংসার। যাই ভাই, বেলা হ'য়ে গিয়েছে, আপিস যেতে দেরী হ'য়ে যাবে, সাহেব না মেরে বসে। বুড়ীর শেষ দিনে এক ঘণ্টা আগে ছুটি চেয়েছিলাম, তাই 'মিথ্যাবাদী বলে গাল দিয়ে বেটা মারতে এসেছিল।"

(৮)

বিজয় বি, এ, পাশ করিয়াছে। গেরুয়া-রঙের সোণার চশমা, গিরিমাটিতে ছোপানো সোয়েটার, মশারি, পাঞ্জাবী ও মোজা, দু'বেলা রাজভোগ সদৃশ খাবার ও চা-বিস্কুট,—মোটর চড়া, তাকিয়া এবং গড়গড়ার স্বপ্নের মধ্যে সে অণুবীক্ষণের দ্বারাও ত্যাগ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া হতাশ মনে সন্ন্যাসী-ঘৃণিত সংসারীর জীবনই শ্রেয় মনে করিল। তিলে তিলে মরিয়া সারাজীবন ধরিয়া যাহারা তাহাকে গড়িয়া তুলিয়াছে—সেই মাতা, পিতা ও ভগিনীর হৃদয়ের রক্তে রঞ্জিত গেরুয়ায় আজ তাহার সন্ন্যাসের দীক্ষা সম্পন্ন হইয়াছে।

ঋণ-শোধা।

[শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

দিনের শেষে রাঙা মুখে
সূর্য্য যে এই ডোবে
ওগো নদীর যে ওই তীরে—
নীল আকাশে ছড়িয়ে পাখা
বিহগ কলরবে

ওগো ছুটে নিজের নীড়ে :—
তাদের আমি সুধাই-ওগো
এই সারাটা দিন
কাহার দেওয়া শোধ করেছ
অসময়ের ঋণ ?

গুন্‌গুনিয়ে ভ্রমর যে ওই
ফোটা ফুলের পাশে
ওগো কতই গাহে গান
শীতল উষার বিভোল হাওয়ায়
ওই যে কুসুম হাসে
(ওগো) কতই যে তার ঘ্রাণ ;—
তাদের আমি সুধাই ধীরে—
এই যে নিমেষ পল্
কাহার দেওয়া ঋণটী ওগো
শুধ্‌ছ অবিরল ?

ফাগুন মাসে নিঝুম রাতে
জোছনা-রাণী দেখি
(ওগো) পিক্ ফুকারি ওঠে,
কালো রাতের অন্ধকারে
কোন্ গুহাতে থাকি

(ঘন) ঝিঁঝিঁর আওয়াজ ছোটে—
তাদের আমি সুধাই—ওগো
কাহার ঋণের ভার
গান গাহিয়া শোধ করিছ
আজকে অনিবার ?

গভীর যখন নিঝুম রাতি
সুধাই তখন ধীরে
(ওগো) হৃদয় দেবতা
ঋণ কি আমার আছে কিছুর
শুধ্‌তে হবে কিরে

ওগো কওসে বারতা ?
জীবনের ঋণ—কয় কে হাসি'—
আনন্দটী দিয়া
শুধ্‌তে হবে এই ভুবনে
ওরে অবোধ হিয়া।

সমাজের কথা।

[শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত]

প্রত্যেক ব্যক্তি যদি আপন আপন অন্তরাত্মার, আপন আপন নিগূঢ় সত্তার চেতনায়ও প্রেরণায় চলে তবে সমাজে আর দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ থাকে না, সমাজে হয়, আনন্দেরই সম্মিলিত বহুল বিচিত্র সমৃদ্ধ সৃষ্টি। কিন্তু এই যে আদর্শ ইহা কি এতই স্পৃহনীয় ? দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠা না করিয়া সমাজকে সাম্যের মৈত্রীর আকাঙ্ক্ষার উপর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইলেও তাহা করা কি উচিত কথাটি আরও তলাইয়া দেখা দরকার। প্রথমত অন্তরাত্মাকে, নিজের নিজের আসল সত্তা ও ধর্ম্মকে—নিজত্বকে ধরিতে হইবে। তাহা পারা যায় কিরূপে ? দ্বন্দ্বকে সংঘর্ষকে উঠাইয়া দিতে চাই—কিন্তু দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ কি কেহই আমাদিগকে বাহিরের দিকে টানিয়া লয়,

তাহা কি কেবল পরের পথের পরের ধর্ম্মের উপর আমাদের লোভ বা আক্রমণ চেষ্টার ফল? বরং ইহাই কি বলা যায় না যে, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষই হইতেছে আত্মচেতনার নিজস্ব উদ্বোধনের উপায়? পরের দ্বারা প্রতিহত হইয়া, পদে পদে বাধা পাইয়াই ক্রমে আমরা ভিতরে প্রবেশ করিতে শিখি, নিজের পথ নিজের ধর্ম্ম খুঁজিয়া পাতিয়া লইতে বাধ্য হই। আমাদের প্রাণ আমাদের মন, আমাদের প্রয়োজনের তাড়া বা বাধ্যবাধকতার টান আমাদিগকে বাহিরের দিকে পরধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করে, স্বীকার করিলাম; ফলে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তাহাও স্বীকার করিলাম। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষই অবার ফিরাইয়া আমাদিগরক ঘরমুখী করিতেছে না কি? অপরের সাথে যুদ্ধ করিতে করিতে, বাধা বিপত্তিকে ঠেলিয়া ভাঙ্গিয়া চলিতে চলিতেই মানুষ আপন আপন শক্তির সামর্থ্যের পরিচয় পায়, অন্তরাত্মাকে প্রবুদ্ধ বিকশিত করিয়া তোলে। যেখানে বাধা বিপত্তি নাই, সকলেই যেখানে স্বেচ্ছামত চলিতে পূর্ণ অবকাশ পাইয়াছে সেখানে ত ভিতরের সত্তা ও শক্তি জোর বাঁধিতে পায় না, প্রতিভা খোলে না—তাহা চলে স্তিমিত-প্রবাহে, ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া ঢলিয়া ঢলিয়া। সত্যযুগ ধর্ম্মরাজ্য শান্তিকে সামঞ্জস্যকে পাইতে পারে, কিন্তু মানুষের অন্তরাত্মা নূতন নূতন সম্বন্ধে ভরাট হইয়া উঠিতে পায় না। সুখ ও স্বস্তিই আদর্শ নয় আদর্শ পূর্ণতর ঋদ্ধতর জীবন। দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ বাধা বিপত্তিই ত জীবনের লুক্কায়িত বৈভব ফুটাইয়া ধরে। দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই মানুষ নিজেকে পাইতে পাইতে চলিয়াছে, নিজেকে সমর্থ করিয়া তুলিতেছে, নিত্য নূতন জ্ঞানে গরিমায় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিতেছে। এই দ্বন্দ্ব যেখানে নাই সেখানে প্রত্যেকে নিজেকে পাইলে পায় ছোট স্কেলে, অল্পমাত্রায়, অন্তরাত্মায় সেখানে পূর্ণ বিস্তারের টান পড়ে না।

তারপর দ্বন্দ্বের সাথে সাথে আছে বৈষম্য; কিন্তু বৈষম্যকে দূর করিয়া সব একাকার করিবার চেষ্টায় লাভ কি? বৈষম্যেরই জন্য জগতে আছে বৈচিত্র বৈদিষ্টাবৈষেমের কুফল মানুষকে ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার সুফলের অধিকারী ত মানুষই, এ কথা ভুলিলে চলিবে কেন? বৈষম্যের ফলে একদিকে যেমন পাই দীন দরিদ্র অজ্ঞানী অক্ষব, ঠিক অন্য দিকেই তেমনি পাই শ্রীমান বিভূতিমান জ্ঞানী সক্ষম; একদিকে যেমন আছে অতল গহ্বর, অন্যদিকে তেমনি আছে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ। কেহ কাহারও সমান নয় অর্থাৎ প্রত্যেকেই আপন আপন সত্তা ও শক্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে, আপন আপন প্রতিভাকে খাটাইয়া জীবনে যতখানি তা যতটুকু পারিতেছে সফলতা লাভ করিতেছে। এই

ব্যবস্থার প্রসাদেই যে পারিতেছে উপরে উঠিয়া যাইতেছে, আর যে পারিতেছে না সে নীচে থাকিতেছে বা আরও নামিয়া যাইতেছে। যে যেমন অধিকারী তাহার তেমনি কর্ম্মফল।—যোগ্যতমের উর্দ্ধতন। যুদ্ধে যাহারা হারিয়া যায় তাহাদের জন্য দুঃখ করিয়া লাভ কি, তাহারা হারিবার উপযুক্তই—বিজয়ী যাহারা তাহাদের দিকে ফিরিয়া দেখ, বৈষম্যের ও সার্থকতা বুঝিবে। শান্তি সাম্য চায় কাহারা? যাহারা অশক্ত, যাহাদের নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই আপন যোগ্যতায় যাহাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নাই—পথের দুর্গমতা যাহাদিগকে চঞ্চল করিয়া তোলে, যাহারা চায় কেবল সুযোগ সুবিধা সহজ সুকর কিছু। সাম্যবাদের ফলে নীচে যাহারা পতিত তাহাদের লাভ কিছু হইতে পারে, তাহারা যৎকিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া যাইতে পারে, কিন্তু উপরে যাহারা, শ্রেষ্ঠ যাহারা, তাহাদিগকে নীচে নামিয়া আসিতে হয়, তাহাদিগকে খর্ব্ব করিতে হয় তাহাদের উদাত্ত সামর্থ্য। সাম্যবাদ সমর্থ অপেক্ষা অসমর্থকেই বেশী মূল্য বেশী মর্য্যাদা দেয়; কিন্তু ইহাতে হৃদয়বত্তা থাকিলেও, মোট জগতকে কি ক্ষতিগ্রস্তই হইতে হয় না? জগতে বৈষম্য যেখানে যত বেশী, সেখানে নিম্নতম স্তর যেমন পাই, উচ্চতম স্তরও তেমন পাই। নিম্নতমকে না রাখিতে চাও, উচ্চতমকেও তবে রাখিতে পাইবে না। যে সমাজে সকলে সমানভাবে মাঝারি ধরণের তাহাই ভাল, না যে সমাজে একদিক খুব ছোটও যেমন আছে আবার খুব বড়ও তেমনি আছে তাহাই ভাল?

সংঘর্ষ ও বৈষম্য না থাকিলে, মানুষের অন্তরাত্মা পূর্ণতা পায় না, সমাজে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট বৈচিত্র বলিয়া কিছু থাকে সা। কিন্তু বাস্তবিক তাহাই কি? মানুষে মানুষে সংঘর্ষ মানুষের একটা ব্যক্তিত্ব বোধকে জানাইয়া তোলে বটে, কিন্তু সে ব্যক্তিত্ব তাহার আসল ব্যক্তিত্ব নয়, তাহার অন্তরাত্মা নয়, সেটি হইতেছে অহংকার বোধ। আর এই অহঙ্কার ত হইতেছে তামসিক অহঙ্কার, প্রাণের অন্ধ আবেগের ক্রিয়া। ফলতঃ, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ যে তামসিক অহংকারকে জাগাইয়া ধরে, তাহা মানুষকে আপন সত্য অহং—অন্তরাত্মা হইতে দূরেই লইয়া ফেলে, অন্তরাত্মার দূরে বাহিরে প্রয়োজনের বা সংস্কারের একটা খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন ঘূর্ণি-মধ্যে মানুষকে সবদ্ধ করিয়া রাখে। তাই আমরা বলিতেছি, অন্তরাত্মার পরি-স্ফূরণের জন্য দ্বন্দ্বসংঘর্ষ দরকার নাই, দরকার ভিতরে একটা তপঃপ্রয়োগ, ঠাসাঠাসি রেশারেশি দরকার নাই, দরকার একটা মুক্ত বিস্তীর্ণ অবকাশ।

আর বৈষম্য না থাকিলে যে বৈশিষ্টত্ব থাকিবে না, এমনও কোন কথা নাই।

মানুষে মানুষে বৈষম্য আছে ও থাকিবে; কিন্তু সে বৈষম্য অর্থ এমন নয় যে, কাহাকেও নীচে আর কাহাকেও উপরে থাকিতে হইবে, উপরে যে থাকিবে সে নীচেকে চাপিয়া থাকিবে! জগতে যে বৈষম্যের খেলা আমরা নিত্য দেখি, সেটি হইতেছে অহংকারের বুভুক্ষার তারতম্য আর কৃত্রিম একটা অবস্থা ও ব্যবস্থা সেই বুভুক্ষার যে সুযোগ ও সুবিধা অথবা যে বাধা ও বিপত্তি আনিয়া দিতেছে কাহারই ফল। অন্তরাত্মায় যে বৈষম্য আছে, তাহা শক্তির বিভিন্ন ভাবমাত্র, ছোট বড় শক্তির রেশারেশি নহে। বাহিরে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে ঈর্ষা ও প্রতিযোগীতা দেখিতে পাই, তাহা সত্যকার বস্তু নয়, সেটি ব্যতিরেকী বা অভাবাত্মক (negative) জিনিষ; ভিতরের অন্তরাত্মার বস্তু হইতেছে স্বভাব ও স্বধর্ম্মের প্রবাহ। প্রত্যেকের অন্তরাত্মা এক এক ধরণের শক্তির বিভূতি, নিজস্ব শক্তিকে নিজস্ব ধরণে ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরিয়াই মানুষ প্রকৃত বৈশিষ্টকে বৈচিত্র্যকে সৃষ্টি করিতে পারে। অন্তরাত্মায় সকলই এক স্তরে দাঁড়াইয়া, তাই সকলেই সমান; তাহার অর্থ নয় যে সব একাকার। আপন আপন অন্তরাত্মার প্রতিভাকে সকলে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে, প্রত্যেকের ক্ষেত্র পৃথক পৃথক—কাহার শক্তি বড় কাহার ছোট, কে উপরে কে নীচে এ প্রশ্ন সেখানে আদৌ উঠে না, তুলনা সেখানে চলে না, কারণ সকলেই অন্তরাত্মাকেই পাইয়াছে ও সৃষ্টি করিতেছে। অন্তরাত্মায় পুরুষে বড় ছোট নাই, উপর নীচ নাই, আছে শুধু নানা ভঙ্গী, বিভিন্ন ধরণ, বিচিত্র রঙ্।

দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ বৈষম্যের ভিতর দিয়া ছাড়া মানুষ কখন অন্তরাত্মার উদ্বোধন করিতে পারে না, অন্তরাত্মার পূর্ণ শক্তি লাভ করিতে পারে না—এ কথার অর্থ এই যে, মানুষকে জোর করিয়া না চালাইলে সে চলিতে চাহিবে না। মানুষের কর্ম্ম মানুষের সৃষ্টি হইতেছে কেবল বাহিরের চাপের জোরজবরদস্তির ফল—আনন্দের কর্ম্ম আনন্দের সৃষ্টি বলিয়া তাহার কিছু নাই। কিন্তু বেত্রাঘাত করিয়াই শিশুকে শিক্ষা দেওয়া চলে, এ ধারণা যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্ত্তমানযুগে আর কাহারও নাই, সেই রকম জীবনের ক্ষেত্রেও সংঘর্ষ বা জোরজবরদস্তি করিয়াই যে কেবল মানুষের মনুষ্যত্ব উদ্বোধন হয়, এ কথাও ন্যায়তঃ আর আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। মানুষের সহজ ধর্ম্ম, তাহার নৈসর্গিক প্রেরণাই হইতেছে অন্তরাত্মাকে জাগাইয়া ফুটাইয়া তোলা, তাহার ভিতরের সারবস্তুকে বাহিরে ছড়াইয়া ফলাইয়া ধরা। মানুষের অন্তরতম সত্তার মধ্যেই আছে একটা টান যাহার ফলে সেই সত্তা আপনা হইতেই আপনাকে বিকশিত করিয়া চলিতে

চায়। অন্তরাত্মার পরিস্ফুরণ প্রয়াস স্বয়ংসিদ্ধ, অন্তরাত্মার আনন্দই এই পরিস্ফুরণে। জোর জবরদস্তির দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের প্রয়োজন যে হইবেই, এমন কোন কথা নাই। এই দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের সুফল যে আমরা সময়ে সময়ে দেখিয়া থাকি, তাহার কারণ অন্য পথ আমাদের চোখে পড়ে নাই, অন্য পথ আছে কি না তাহা জানিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার চেষ্টা বা কৌতুহলও আমাদের তেমন হয় নাই। তাহা যদি হইত তবে বুঝিতাম, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ খুব ভাল হিসাবে ধরিলেও হইতেছে বড় জোর মন্দের ভাল (second best thing); আসলে কিন্তু দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ কিছুদূর উঠাইয়া ধরিলেও একেবারে চরমে, অন্তরাত্মার মধ্যে আমাদিগকে কখন পৌঁছাইয়া দিতে পারে না—প্রথমে সহায় হইলেও পরে তাহা বাধাই হইয়া দাঁড়ায়, অন্তরাত্মার সম্মুখে একটা যবনিকাই সে খাড়া করিয়া দেয়।

মানুষ যদি কেবল পশুই হইত তবেই বোধ হয় সংঘর্ষের লগুড়াঘাতে সে উপকার পাইত। কিন্তু মানুষের মধ্যে স্পষ্টই দেখিতে পাই, জাগিয়াছে একটা আত্মসংবিৎ—এই আত্ম-সংবিৎ নিজের শক্তিতেই শক্তিমান্, নিজের আনন্দের জোরেই নিজের পূর্ণ সার্থকতার দিকে চলিতে পারে ও চলিতে চাহে। দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ এই আনন্দকে দীর্ণ করিয়া দেয়, ঐ শক্তিকে ছিন্ন করিয়া ফেলে। মানুষের অন্তরাত্মা নিজের সামর্থ্যেই সমর্থ—রাস্তা যদি পরিষ্কার থাকে, ক্ষেত্র যদি উদার বিস্তৃত হয়, তবে নিজের বেগেই সে নিজে চলিতে পারে, আপন প্রতিভাতেই আপনার চরম সৃষ্টি করিতে পারে।

জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, মানুষ যদি এতখানি স্বয়ংসিদ্ধ, তাহার অন্তরাত্মা যদি এত সমর্থ, তাহার আনন্দ যদি এত বলীয়ান তবে বাহিরের সংঘর্ষে কি আসে যায়? সংঘর্ষ বা সাম্যমৈত্রী দুই-ই তাহার কাছে অকিঞ্চিৎকর, উভয়েরই অতীত সে। ফলতঃ দেখি না কি, শক্তিমান্ যে, প্রতিভাশালী যে, সর্ব্বাবস্থায় সে আপনার পথ করিয়া লইয়াছে—সুযোগ বা দুর্যোগ, অনুকূল বা প্রতিকূল কিছুরই সে তোয়াক্কা রাখে না, শান্তি বা সমর দুই-ই তাহার প্রতিভাকে উপচিতই করিয়া চলিয়াছে? বরং এই কথাই কি বলা যায় না যে, দ্বন্দ্বসংঘর্ষ-প্রতিকূল অবস্থাই হইতেছে অন্তরাত্মার শক্তির বা আনন্দের কষ্টিপাথর? সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে জয় করিয়া অতিক্রম করিয়া টিকিয়া আছে যে সেই শক্তি সেই আনন্দই খাঁটি, তাহারই বর্ত্তিয়া থাকিবার অধিকার আছে? দ্বন্দ্বসংঘর্ষ সহায় না হউক, বাধা হিসাবেও ইহাদের সার্থকতা আছে, কারণ বাধা দিয়া ইহারা অন্তরাত্মার শক্তির সামর্থ্যের আনন্দের মূল্য যাচাই করিয়া দিতেছে।

এ কথা সত্য, আপাততঃ আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম। মানুষ যতদিন অন্তরাত্মার স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, ততদিন না হয় সংঘর্ষের বৈষম্যের একটা প্রয়োজনীয়তা থাকিল, কারণ ততদিন মানুষ পশুভাব হইতে একান্ত মুক্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সংঘর্ষ ও বৈষম্যকে যদি চিরন্তন করিয়া রাখিতে চাই তবে উহাদের যে প্রয়োজন ঠিক তাহাই ব্যর্থ হইবে। সংঘর্ষ ও বৈষম্যের লক্ষ্য যাহাতে হয় সংঘর্ষও বৈষম্যকে ছাড়াইয়া সম্মিলন ও সাম্যের মধ্যে পৌছিতে, বাহিরের প্রতিযোগিতা যাহাতে আমাদিগকে লইয়া চলে অন্তরাত্মার সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে, পশুভাব পশুত্বকে অতিক্রম করিয়া যাহাতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে একটা দেবভাবে, সে রকম মনের অবস্থা ও সমাজের ব্যবস্থা যদি না তৈয়ার হইতে থাকে তবে ঐ সব উপায়ের আশ্রয়ের পূর্ণ সার্থকতা নাই।

কিন্তু তাহা কি কখন হয়? সংঘর্ষ কি কখন আপনা আপনি সম্মিলনে, প্রতিযোগিতা একাত্মায়, পশুভাব দেবতায় পরিণত হইতে পারে? এ যেন যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধ নিরসন করিবার প্রয়াস (The war that will end war) কিন্তু আজ কি অস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না, এস্বপ্ন আমাদের কত অমূলক—যুদ্ধ কেবল যে যুদ্ধেরই বীজ বপন করে? ভোগের দ্বারা ভোগ উপশম হয় না, বরং তাহা বাড়িয়াই চলে। সংঘর্ষ বা প্রতিযোগিতা মানুষের মধ্যে যে শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে, সেটা হইতেছে পশুর শক্তি, বড়জোর আসুরিক শক্তি। জোর জবরদস্তিতে যে শক্তি বল পায়, পাকা হয় তাহা আত্মার বল নয় সেটা হইতেছে মনের প্রাণের মধ্যে জড়াইয়া আছে যে অহংকারের মাৎসর্য্য, দাম্ভিকতা। সংঘর্ষ প্রতিযোগিতা জোরজবরদস্তি অহংকারেরই খোরাক জোগায়, অহংকারকেই সঞ্জীবিত জীবন্ত শক্তিমান করিয়া তোলে। আবার অহংকারকেও কেবল অহংকারেরই উপর ভর করাইয়া অন্তরাত্মায় পৌছান যায় না, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের ভিতর দিয়া অহংকারকে অন্তরাত্মার চেতনায় রূপান্তরিত করা যায় না।

তারপর প্রতিভাবান্‌দের কথা। আমরা দেখিতে পাই কোন দ্বন্দ্বের মধ্যে সংঘর্ষের মধ্যে—তাহা বাহিরের হউক, আর এমন কি ভিতরেরই হউক—যে প্রতিভা লালিত পালিত পরিপুষ্ট তাহার সৃষ্টিতে, তাহার ধর্ম্মে কর্ম্মে লাগিয়া আছে সেই দ্বন্দ্বের সংঘর্ষেরই একটা ছায়া, তাহাতে অন্তরাত্মার পূর্ণতা ধরা দিতে পারে নাই, সেখানে মিশিয়া আছে নীচের স্তরে অহংকারেরই একটা রেশ। নীটশের মধ্যে দেখিতে পাই যে একটা অতৃপ্তি একটা চাঞ্চল্য একটা দুঃখ, তাহার কারণ কতকটা বটে জগতের মানুষের বাস্তব অবস্থা আর তাঁহার আদর্শোচিত জগৎ

মানুষ এই দুইএর মধ্যে বিপুল পার্থক্যের অনুভূতি—কিন্তু আসল কারণ তাঁহার ভিতরে সেই আদর্শেরই মধ্যে। নীটশের অন্তরাত্মায় ছিল একটা আদর্শ একটা উপলব্ধি কিন্তু তাঁহার মনের প্রাণের উপলব্ধি আদর্শ সেই অন্তরাত্মার উপলব্ধি আদর্শকে সম্যক প্রকাশিত হইতে দেয় নাই, তাহাকে বিকৃত করিয়া ধরিয়াছে; তাই সেই অন্তরাত্মায় অতৃপ্তিই শতভাবে ভঙ্গিমায় মনে প্রাণেও ছুটিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়াছে। নেপোলিয়নের অন্তরাত্মাও নেপোলিয়নের কর্ম্মে পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারে নাই (প্রমাণ তাঁহার নিজেরই অনেক কথা, বিশেষতঃ তাঁহার বন্দী-অবস্থার জীবন কাহিনী); নেপোলিয়নের জীবন—অন্ততঃ নেপোলিয়নের দিক হইতে—যে একটা ট্রাজেডি, তাহার কারণ আমরা বলিব এই যে তিনি সজ্ঞানে পূর্ণভাবে অন্তরাত্মার স্তরে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই, অন্তরাত্মার মুক্ত জাগ্রত প্রেরণার কর্ম্ম করেন নাই, তিনি দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের উপরে উঠিয়া দ্বন্দ্বকে সংঘর্ষকে চালান নাই, তিনি অন্তরাত্মাকে মনের প্রাণের মধ্যে নামাইয়া দিয়া, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মধ্যে থাকিয়া তবে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ করিয়াছেন, কর্ম্ম করিয়াছেন। বায়রণ অথবা গেটে অপেক্ষাও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মধ্যে যে পাই একটা উচ্চতর উদারতর নিবিড়তর কবিদৃষ্টি, তাহার কারণ দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মধ্যে থাকিয়া বাধাকে বিপত্তিকে সম্মুখে রাখিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি তাঁহার প্রতিভায় জগৎকে সৃষ্টি করেন নাই, তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন অন্তরাত্মায় উঠিয়া গিয়া অন্তরাত্মার স্বতঃসিদ্ধ সহজ প্রেরণার বলে; আর বায়রণ বা গেটে নেপোলিয়নেরই মত দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের স্তরেই অন্তরাত্মাকে একটা পর্দ্দার আড়ালে—সে পর্দ্দা যতই সূক্ষ্ম বা পাতলা হউক না কেন, পর্দ্দার আড়ালেই ফেলিয়া রাখিয়াছেন—গেটের মধ্যে ছিল চিন্তা-জগতের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ, বায়রণের ছিল প্রাণ-জগতের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ। বাস্তবিক পক্ষে, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ যে প্রতিভাবানদের প্রতিভাকে ইন্ধন যোগাইয়া প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছে তাহা নয় অথবা বাধা দিয়া তাহার দাম কষিয়া দিতেছে এমনও নয়। প্রতিভাবান্‌দের প্রতিভার ইন্ধন প্রতিভারই ভিতরে, প্রতিভার কষ্টিপাথরে প্রতিভা স্বয়ং।

দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ হইতেছে মনের প্রাণের শরীরের ক্ষেত্রে—কিন্তু প্রতিভার উৎস যেখানে সেই অন্তরাত্মার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ নাই। অন্তরাত্মায় যতদিন উঠিতে পারিতেছি না, ততদিন অন্তরাত্মার যে স্বতঃ স্ফূর্ত্ত স্বয়ংসিদ্ধ প্রেরণা তাহাই মনে প্রাণে শরীরে প্রতিযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপের ভিতর দিয়া প্রকাশ হইতেছে। এই চাপ দূরীভূত হইলে ভিতরের প্রেরণাও যে সেই সঙ্গে বন্ধ হইয়া যাইবে তাহা নয়, বরং সেই প্রেরণা মুক্তপথে স্বরূপে স্বভাবে ফুটিয়া উঠিবে, মনে প্রাণে দেহে

সঞ্চারিত হইবে। বিরুদ্ধ শক্তির উপর ভর করিয়া দাঁড়ায় অহংকারের শক্তি, অহংকারই চায় আপন প্রতিষ্ঠার জন্য বিরুদ্ধ শক্তি; কিন্তু অন্তরাত্মার তাহা প্রয়োজন হয় না, অন্তরাত্মার শক্তি হইতেছে নিজের আনন্দের তপঃসৃষ্টি। অহংকার লুপ্ত হইলে অন্তরাত্মার বৈশিষ্ট লুপ্ত হয় না, বরং আপন প্রকৃত বৈশিষ্ট, উদার স্বাতন্ত্র্যেই ভরাট হইয়া অন্তরাত্মার প্রতিভা তখন প্রবাহিত হইতে পারে।

দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের উপর—প্রতিযোগিতার উপর সমাজ যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মনে রাখিতে হইবে, সেটি একটি অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থামাত্র,বিবর্ত্তনের একটা বিশেষ স্তরের সত্য। কেবল অন্তরাত্মার কোন ইঙ্গিত যতদিন মানুষের মধ্যে স্পষ্ট দেখা দেয় নাই, মানুষ যতদিন শুধুই মনের বাদ বিচার, প্রাণের অন্ধ আবেগ আর শরীরের আশু-প্রয়োজনের তাড়নায় চলিতেছে ফিরিতেছে, মানুষের 'আমি'র সীমা যতদিন এই ভোগায়তনের পরিসর টুকু অর্থাৎ মানুষ যতদিন পশু হইতে খুব বেশী বিভিন্ন নয়, ততদিন সমাজের মাৎস্য ন্যায় ব্যবস্থার প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে। মানুষ যাহাতে জড় মৃত না হইয়া পড়ে, যাহাতে তাহার মধ্যে থাকে একটা প্রাণের স্পন্দন, জীবনের আবেগ সেই জন্য দরকার একটা বুভুক্ষা, একটা আত্মাভিমান। আত্মার বা অন্তরাত্মার জ্ঞান ও অনুভূতি মানুষের যখন নাই, তখন অহং এর এই ছোট আত্মাটি ভাল করিয়া চিনিতে হইবে বুঝিতে হইবে—তাহার শক্তির ও আসক্তির সকল দিক সকল সীমা দেখিয়া শুনিয়া লইতে হইবে। এই রকমেই অবিদ্যাকে যে ঘনীভূত করিয়া লইতেছে, সকল ছড়ান লুকান আঁধারকে একত্রিত কেন্দ্রগত করিয়া ধরিতেছে, কিন্তু পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে পরবর্ত্তী পদবিন্যাসে বিদ্যার মধ্যে আলোকের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য—উপর দিকে রাত্রি যত অগ্রসর হইতেছে ততই না দেশের অন্ধকার নিবিড়তর হইয়া উঠিতেছে?

কিন্তু অন্তরাত্মা যখন জাগিয়াছে, মানুষ অহংকারের উপরে, মন প্রাণ দেহের ঊর্দ্ধে তাহার গভীরতম সত্তার সন্ধান পাইয়াছে—উষার প্রথম রশ্মিটুকু যখন দেখা দিয়াছে—তখনও যদি সেই পূর্ব্বব্যবস্থা অনুসারেই সে চলিতে থাকে, তবে সেটা হইবে তাহার অধর্ম্ম, অভ্যাসের সংস্কারের জের মাত্র; তখন তাহার ধর্ম্ম গতানুগতিকের কাঠামকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, নূতন প্রাণবন্ত ব্যবস্থার সংস্থাপন —সবিতা যখন উদিত তখন সবিতারই ধর্ম্মে আমাদের কর্ম্মকে গড়িয়া সাজাইয়া উঠাইতে হইবে।

যদি জিজ্ঞাসা কর, অন্তরাত্মা জাগিয়া থাকিলে অন্তরাত্মাই ত আপন ইচ্ছামত আবশ্যকমত সব সৃষ্টি করিয়া লইবে, তবে আমাদের এ সব চেষ্টার প্রয়োজন কি

মূল্য কি, আমাদের এ সব ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ পণ্ডশ্রম মাত্র কি নয়? এ কথার উত্তরে আমরা এখানে শুধু এই টুকু বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইব যে আমাদের এই সব চেষ্টা এই সব শ্রম অন্তরাত্মারই প্রেরণার বিভিন্নরূপ, অন্তরাত্মারই আপন কর্ম্মের প্রণালীর অন্তর্গত।

মানবজাতির অন্তরাত্মা জাগিয়াছে কি না, মানুষ প্রাচীন পরিচিত অভ্যস্ত সমাজব্যবস্থাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবার মত প্রস্তুত হইয়াছে কি না, অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠানের অধিবাসী হইবার অধিকারী সে হইয়াছে কি না—এ প্রশ্নের মীমাংসা বিচারে সম্ভব নয়, ইহার মীমাংসা একমাত্র—ফলেন পরিচীয়তে। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে বৃথা প্রমাণ সাজাইবার যত্ন হইতে আমরা বিরত হইলাম।

তদ্গত।

[শ্রীকালিদাস রায়]

সখি—তোমার পায়ের পরশ পেতে
মোহন চূড়া হেলে থাকে
ঘুরে—বদন কমল-মধুর আশে
নয়ন-ভ্রমর ফাঁকে ফাঁকে।
তোমার তনু আলিঙ্গিতে
নেচে নেচে চুমা নিতে
লীলায়িত হলো তনু
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম বাঁকে।
লুলিত এ বাহু দুটী
লতিয়ে পড়িছে লুটী
কটি তোমার কণ্ঠ তোমার
জড়াইতে পাকে পাকে॥
গতি বিধি জানাতে সই
পায়ে নূপুর পরে লো রই
তোমার লাগি বাজাই বাঁশী
বাঁশী রাধারাধাই ডাকে॥

নারীর সমানাধিকার।

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

সম্ভবে কিনা বর্ত্তমান যুগেও এখনও সমস্যা! সমানে সমানে সম অধিকার। সে সামঞ্জস্যের প্রকৃত স্বরূপ সন্ধানে বাঙ্গালীর শতাব্দীর পর শতাব্দীর চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে,—বস্তুটা এখনও ফুটিয়া উঠে নাই। কিন্তু এই ব্যর্থতা পণ্ডশ্রমের শূন্য দীর্ঘশ্বাসে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত করে নাই,—রাখিয়া গিয়াছে সভ্যতার ভাণ্ডারে দিবার অমূল্য সম্পদ। বৈষ্ণব সাহিত্যের সৌন্দর্য্য পিপাসা,—সেই কবিদিগের রমণী-কটাক্ষের শত প্রকারের বিশ্লেষণ শ্রেণীবিন্যাস, হাস্যের অধরকুঞ্চনের রেখার পর রেখাটীকে ধরিয়া নব নব ভাবের প্রতীক রচনা; —প্রতিপদক্ষেপে পদনখ হইতে নিতম্ব পর্য্যন্ত—দেহের ভঙ্গিমার বিভিন্ন অর্থনির্দ্দেশ,—এ সমস্ত কেবলি যে জড়-দেহের উপর নির্নিমেষ নয়ন পাতের ফল তাহা নহে,—ইহারই উপর প্রতিফলিত অন্তর্লোকের আর একটা রহস্যময় প্রকাশ, এই ভাষা এই উপমা উৎপ্রেক্ষাবলীর মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত দেখিতে পাই। বেশ বুঝিতে পারা যায় তাঁহাদের সে রূপতৃষ্ণা সুদ্ধ রূপের জন্যই নহে, রূপের মধ্য দিয়া প্রেমের —অরূপের তৃষ্ণাই সেখানে প্রবল।—এই দিক দিয়া তাঁহাদের বিচার করিলে বলিতে হয়, তাঁহাদের কাছে নারীত্ব হেয় হয় নাই, একটা মর্য্যাদাই পাইয়াছে। কিন্তু আজ,—এই বিংশ শতাব্দীতে অবিকল সেই শ্রেণীর মর্য্যাদাতে আমরা পরিতুষ্ট হইব না! এ মর্য্যাদা সেই নারীকে দেওয়া হইয়াছে যে নারীর পদবী হইতে আজ আমরা উঠিতে চাহিতেছি।—এ মর্য্যাদা আমাদের কাছে বৈদেশিক মর্য্যাদা। আমরা সে জ্ঞানলাভ করিয়াছি যে ইহার দ্বারা নারীত্বের আংশিক তৃপ্তি হয় মাত্র,—পরিণতি আদৌ হয় না।

এই ভাবপ্রবণ প্রেমিকের দল আমাদের বুঝিতে আসিয়া আমাদের মধ্যে আপনাদের হারাইয়াও ফেলিয়াছেন, আর তাহার ফলে এমন অমৃত উঠিয়াছে যাহার আস্বাদ বাংলা আজও ভুলিতে পারে নাই,—কোনও দিন পারিবেও না। সেটাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই আমি চাহিতেছি যে ইহাকেও অতিক্রম করিয়া উঠিতে হইবে। এখানে তোমরা মাত্র একটা উপায়ের সন্ধান পাইয়াছ তোমাদের নিজেদের বুঁদ করিয়া রাখিয়া অনন্তের স্বাদটুকু পাইবার। জানিও ইহা প্রতিফলিত পদার্থ। চতুর্দ্দিক থিতাইয়া উঠিলে যে যোগৈশ্বর্য্য ফুটিয়া উঠিবে

অনেক সন্তর্পণে একটা দিক থিতাইয়া লইয়া সেখানে ও তো তাহারই একটু প্রতিবিম্ব দেখা মাত্র। পথের মাঝে একটী বৃক্ষতল পাইলে সেখানে অনন্তকাল বসিয়া বিশ্রাম চলে না। গন্তব্য আবাসের কথা মনে থাকা চাই।

শুধু বৈষ্ণব নহে, তান্ত্রিক সাধকের মধ্যেও দেখিতে পাই,—এই নারীকে প্রাত্যহিক প্রাকৃত সুখমগ্ন জীবনের অবজ্ঞা হইতে ঊর্দ্ধে তুলিবার চেষ্টা। এ সাধনায় পুরুষ প্রেমে নারী হয় নাই, পুরুষ থাকিয়াই,—রক্তমাংসের আস্বাদের মধ্য দিয়া নর নারীর ব্যবধানের মধ্যে মানুষে মানুষে যে উগ্রতা হিংস্রত্য ফুটিয়া উঠে, সেটাকে শক্তিপ্রয়োগে শ্রদ্ধার সঞ্চার করিয়া,—সরসতা ও সজীবতায় রূপান্তরিত করিয়া তুলিতে অমানুষী চেষ্টা পাইয়াছে। ভারতের দুর্ভাগ্য, জড়ত্বের প্রভাবে এখানের বায়ুমণ্ডল আর্দ্রবাষ্পে সমাচ্ছন্ন; সঙ্কল্পের প্রাণময়ী বিদ্যুৎ-শিখা সহজেই স্তিমিতপ্রভ হইল,—সে প্রেরণা অনুষ্ঠানের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কতকগুলি উপধর্ম্মের প্রসূতি মাত্র হইয়াছে। হায়রে! এতখানি মঙ্গলেচ্ছার এমন পরিণাম!

ইহাই হয়। গতানুগতিকে নূতনে সন্ধি চলে না। মঙ্গল সঙ্কল্পটাকে সে দিন কেহ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করে নাই। সহজে কাজ সারিতে গিয়া ধর্ম্মের নামে একটা কুহক সৃষ্টির চেষ্টা চলিয়াছিল। মঙ্গল সঙ্কল্প ঘুলাইয়া উঠিবে বিচিত্র কি? —আর যাহাকে তুলিবার চেষ্টা তাহাকে তাহার আত্মদায়িত্ব সর্ব্বাগ্রে বুঝাইতে হয়। নাবালক রাখিয়া কাহাকেও মানুষ করা চলে না। এ সব কথা সে দিন চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

এ সমস্ত সত্ত্বেও আমি ইহাদের কাহাকেও পরিত্যাগ করিব না।—ইহারাও যে সোপানের এক একটী ধাপ। যতটা হইয়া গিয়াছে আমি তাহারই পরিণতি চাহি। যে প্রেরণা পরকীয়া প্রেম উপধর্ম্মের উপলক্ষ্য, যে প্রেরণা পঞ্চ মকার চক্রের উপলক্ষ্য, আর গতানুগতিকের যে সতর্ক সন্দিগ্ধ শক্তিময় দৃঢ়তা ইহাদের বিরোধী, আমি সকলেরই অনুবর্ত্তন করি। এই সমস্ত নব নব মতের উত্থান সংগ্রাম পতন, তারপর উপধর্ম্ম রূপান্তরিত হইয়া গতানুগতিকের কুক্ষিতলে আশ্রয় লাভ, সমস্তকে শ্রদ্ধাপূত দৃষ্টি দিয়া অন্তরে অন্তরে চিনিয়া লইয়াই আমি সেই অভিজ্ঞতার উপর অতীত অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণতা দিবার প্রয়াস পাইব। আমি জানি, আজ নয়, বাংলায় বহু বহু শতাব্দী ধরিয়াই আমাদের তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। নারীর উন্নতির আন্দোলন নাম আমি এই সমস্তকেই দিব। ইয়োরোপের দৃষ্টান্ত ইহার পথ প্রদর্শক নহে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আন্দোলন ইহার

সূত্রপাত নহে। ইহারা সুদূরপ্রবাহিত একটী ধারার তরঙ্গ (Episode) ইহাই বলিতে পারি।

এ কথা কে বুঝিবে না যে আমাদের সম্বন্ধে হৃদয় বৃত্তির স্পষ্টতা, সত্যের উপলব্ধি, ভারতের আধ্যাত্মিকতারই অঙ্গবিশেষ। জগতের সহিত আপনার সম্বন্ধ নির্ণয়ই ত আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। আমাদের নারী ও নরের পরস্পর পার্থক্যের উপরই ত জগৎপ্রপঞ্চের ভিত্তি, সুতরাং এটার মধ্যে কত রহস্য আছে সমস্তের মীমাংসা না করিলে জগৎপ্রপঞ্চ চক্ষু হইতে মুছিবে কেমন করিয়া ?

অনন্ত চেষ্টার ব্যর্থতা স্তরে স্তরে জমিয়া নিরেট প্রস্তরাকারে বাঙ্গালীর মনে প্রভাব বিস্তার করিয়া একটা নিরাশার অন্তঃপুর রচনা করিয়াছে। ইহারই চলিত নাম গোঁড়ামী। এই পুরপ্রাচীর ভেদ করিয়া সেখানে তুলিতে হইবে চেতনার, আত্মার, তড়িৎ স্পন্দন। এবার বার বার আত্মপরীক্ষার পর তবে যেন আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে নামি। যে অশুদ্ধতা বার বার দূষিত তড়াগের শৈবাল দামের মত সরিয়া আবার আসিয়া মুক্ত স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে এবার যেন অব্যর্থ হস্তে তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া পূতিপঙ্ক সহ চিরতরে বিনষ্ট করিতে পারি। এবারের কার্য্যে সত্যকার সাফল্য আনিতে হইবে। প্রত্যেক বারের পদ্ধতিতে যে ভ্রম প্রমাদ ছিল সে সমস্তই আমার ভগবান চক্ষের উপর দেখাইয়া দিতেছেন। যে দুর্ব্বলতা ছিল তাহার উপরে উঠিবার জন্য আমার ভগবান আকর্ষণ করিতেছেন। আজ সেই স্পর্শে প্রজ্বলিত অগ্নির মত তপ্তশ্বাসী অন্তরাত্মা বলিতেছে তপঃ, তপঃ, তপঃ, !

নারীর উন্নতিতে শুধু নারীরই উন্নতি হইবে না,—হইবে জাতির উন্নতি। নারীর আত্মার উদ্বোধন একা তাহার জন্য নহে, ইহার উপর সমগ্র মনুষ্য স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন নির্ভর করিতেছে। এত বড় পরিণাম এত বড় জয় যাহাদের তপস্যার লক্ষ্য তাহারা আশ্বস্ত হও। তপস্যা আরম্ভ হইয়াছে। উত্তরসাধক স্বয়ং ভগবান। এস উদ্বুদ্ধ আত্মা সর্ব্বজড়তা নামাইয়া রাখ, সংশয় সন্দেহ তর্ক বিতর্ক কিছুই নহে। আপনাকে এই প্রবাহের মুখে সঁপিয়া দিলেই বুঝিতে পারিবে তোমার চিৎপ্রকাশ কেমন প্রখর কিরণে জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

গোড়ার ভাব ধরিয়াই আমি অগ্রসর হইব। আমি হিন্দু। আমি জানি আমার হিন্দুত্ব আচারে নহে অভিমতে নহে অনুষ্ঠানে নহে আমার হিন্দুত্ব আমার সত্যে। আমার নিগূঢ় সিদ্ধ স্বভাবে। আমার স্বাভাবিক প্রেরণায় বহুর মধ্যে

একত্বের অনুভব চেষ্টায়। জানি ভারতের সমগ্র ইতিহাসের মধ্য দিয়া বহু বহু সংঘর্ষে এই অনুভবের পূর্ণতার উপরেই হিন্দুর হিন্দুত্ব আপনার বিরাট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। জানি হিন্দুর জাতীয়তা বিকাশে এখনও পূর্ণচ্ছেদ পড়ে নাই। এখনও অনন্ত সম্ভাবনা। তাই আমার প্রেরণার স্বরূপ, আমার মধ্য দিয়া যাহা প্রকাশিত হইবে তাহা কি সমস্তই আমি বুঝিতেছি !

নর নারীর বিভিন্ন প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্যটাকে সত্য করিয়া দেখাটা ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম একত্বে। ধর্ম্ম প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া আত্মার মধ্যে পরস্পরের সাক্ষাৎকার। এই দিক দিয়াই আমি নরনারীর সমানত্বের উপর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিব। জানি অপর কোনও উপায়েই তাহা হইবে না। কোনও ফাঁকি নাই কোনও ইন্দ্রজাল নাই। পথ এই একমাত্র, যে পথে চলিলে অমোঘ ভাগবত বিধানে আপনিই সমস্ত সম্পন্ন হইবে।

বৈষ্ণব প্রেমের মধ্য দিয়া নারীকে তুলিতে গিয়া নারীত্বের কাছে আপনি প্রতিহত হইল। নারীর দিক দিয়াই সমষ্টির পতন হইল। শাক্ত আপনাকে বড় করিয়া নারীত্বকে উঁচাইয়া যাইবার সাধনা করিয়া ছিল পুরুষের দিক দিয়াই সমষ্টির পতন হইয়াছে। অতিপৌরুষ কিংবা অপৌরুষ কোনওটায় নারীত্বকে উঁচাইতে পারিবে না। নারীত্বের খোলস হইতে নারীকে বাহির করিতে হইলে স্বতন্ত্র একটা তৃতীয় পন্থা চাই। পথ সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান হইবে অস্ত্র। শক্তি প্রেম আধার হইতে অজস্র ধারেই ঝরিবে কিন্তু সে আধার ভগবানের চরণে উৎসর্গীকৃত। তাহাতে আর "আমি" বলিয়া কিছু নাই। আছে ইচ্ছা, যে ইচ্ছা ভাগবত ভাব হইতে উদ্ভূত; আর চেষ্টা, যে চেষ্টায় জাতিভেদ নাই, সে আধিকারিক পুরুষের আপনার জীবন যজ্ঞ, কেবল সমষ্টির কথাই তাহার গ্রাহ্য।—এই পথের শেষেই একত্ব আসিবে।

ভাবটা পরিপাক করা বড় কঠিন, বুঝিয়া উঠাই অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য হইতেছে তাহা জানি। জীবন ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে ব্রহ্মানন্দে বিভোর থাকিয়া একত্ব মধ্যে পার্থক্যকে ডুবাইয়া দেওয়া চলে,—অন্যত্র সম্ভবে না—বিশেষ আবার নরনারীর মধ্যে। আর এ পার্থক্যেরও ত একটা দিক আছে সেটা অনাদি অনন্ত সৃষ্টির চিরন্তন সামগ্রী। নর এবং নারী, এ ত মানুষের কল্পিত পার্থক্য নহে, এ ত স্রষ্টার সৃষ্টি বিশ্ববিধানের অঙ্গ। ইহাদের মিশাইয়া এক করিবে কি করিয়া ? একি কখনও সম্ভব ?

সম্ভব বৈকি, তবে সম্ভাবনার স্বাভাবিক দিকটা দেখিবার চক্ষু যে আমাদের

গিয়াছে। যে ভাবে সমস্ত ঘুরাইয়া দেখা আমাদের অভ্যাস তাহাতে এই সরল সত্য বুদ্ধিগোচর হইতে বহুদিন লাগিবে জানি।

আমি ত বহুপূর্ব্বেই বলিয়াছি কোনও কিছুকেই আমি অস্বীকার করি না। আমি সমস্তেরই সার্থকতা স্বীকার করি। আমার এ একত্ব পার্থক্যকে ঘুচাইয়া নহে ত, -সমস্ত পার্থক্যকে সামঞ্জস্যে শৃঙ্খলিত করিয়া,—তাহাদের খণ্ডের ধর্ম্ম-গুলিকে উপচিয়া দিয়া সেই প্লাবিত অগাধ অতলতার উপর।

যে ভাবে বিশ্ব বিধান অব্যাহত যে ভাবে প্রকৃতির সৃজন শক্তি অফুরন্ত, সেই ভাবের অনুপ্রেরণা উদ্দীপ্ত হইয়া নর নারী পরস্পর পার্থক্যের মধ্যে যে মাধুর্য্য যে রস তাহা স্বীকার করিবে কিন্তু লক্ষ্য থাকিবে তাহারই দিকে যে উদ্দেশ্য এই পার্থক্যের উৎসমূল। এই যৌন ও ভাগবত জীবনের একত্র সম্মিলন, একই ক্ষেত্রে জীবন ও সত্যের আস্বাদ এ সত্যই অপূর্ব্ব। সত্যই এখনও অনাবিষ্কৃত। কিন্তু ইহারই মধ্যে নর নারীর পূর্ণতা। তাহাদের পার্থক্যের সফলতা ও পরিণতি। আর ইহাই হিন্দুত্বের ভবিষৎ বিকাশ। বহুদিন হইতে এমনি একটা মীমাংসার জন্য বাঙ্গালী বারেবারে বিচিত্র ভ্রমের অনুষ্ঠান করিয়াছে।

নর নারী উভয়েই যখন এই একত্বের সাধনায় পরস্পরের মূলউৎস বুঝিতে পারিবে, সমগ্র জীবন যে একের ইঙ্গিতেই পরিচালিত তাহা বুঝিবে, তখন বহুর মধ্যেও একের মূর্ত্তিই পরিলক্ষিত হইতে থাকিবে। একত্বই থাকিবে লক্ষ্য, বহুত্ব হইবে উপায় মাত্র।—এইরূপে আমরা আধ্যাত্ম সাধনায় অন্তরে সমান হইব। বাহিরের সমান অধিকার সে ত তখন তাহারই অনিবার্য্য ফল।

সহজ দান।

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়।]

তোমার অন্তর হ'তে যা' দেবার আছে,
তোমার মর্ম্মের মাঝে যে বাণী বিরাজে,
নির্ভয়ে সহজে তুমি তাহা দিয়া যাও,
সে বাণী অকুণ্ঠকণ্ঠে জগতে শুনাও।

ভিক্ষাঝুলি স্কন্ধে ল'য়ে ফিরি' দ্বারে দ্বারে,
বাড়ায়োনা নিতি আর নিজ দৈন্য-ভারে;
বাহিরের রত্ন—সে যে অন্তরের ছাই,
বাড়ে তাহে' কমেনা তো প্রাণের বালাই।
তার চেয়ে দিয়া যাও দুমুঠি ভরিয়া
তোমার প্রাণের গাথা নিঃশেষিয়া হিয়া;
হউক সে ক্ষুদ্র আজ সকলের কাছে,
সত্যের অমর বীজ তাহে রহিয়াছে।
এক দিন মুকুলিত হ'বে তার আশা,
ধ্বনিবে সহস্র কণ্ঠে তা'র মৌন ভাষা;
জাগিয়া উঠিবে সুপ্ত স্তম্ভিত ধরণী
একদা শুনিয়া তা'র মহাপ্রতিধ্বনি।

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা।

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মাণিকতলার বাগানে যখন আশ্রমের সূত্রপাত হইল তখন সেখানে চার পাঁচ জনের অধিক ছেলে ছিল না। হাতে একটিও পয়সা নাই, ছেলেরা সকলেই বাড়ী ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাহাদের মা বাপদের কাছ থেকেও কিছু পাইবার সম্ভাবনা নাই। অথচ ছেলেদের আর কিছু জুটুক আর নাই জুটুক দুবেলা দু'মুঠা ভাত ত চাই! দু একজন বন্ধু মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন আর স্থির হইল যে বাগানে শাক সব্জীর ক্ষেত করিয়া বাকি খরচটা উঠাইয়া লওয়া হইবে। বাগানে আম, জাম, কাঁটালের গাছও যথেষ্ট ছিল। সেগুলা জমা দিয়াও কোন্ না দু দশ টাকা পাওয়া যাইবে? আর আমাদের খাইতেও বেশী খরচ নয়—ভাতের উপর ডাল আর একটা তরকারী। অধিকাংশ দিনই আবার ডালের মধ্যেই দুই চারিটা আলু ফেলিয়া দিয়া তরকারীর অভাব পুরাইয়া লওয়া হইত। সময়াভাব হইলে খিচুড়ীর ব্যবস্থা। একটা মস্ত

সুবিধা হইল এই যে বারীন তখন ঘোরতর ব্রহ্মচারী। মাছের আঁশটী পর্য্যন্ত বাগানে ঢুকিবার হুকুম নাই ; তেল, লঙ্কা একেবারেই নিষিদ্ধ।

উপার্জ্জনের আরও একটা পথ বারীন্দ্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিল—হাঁস ও মুরগি রাখা। কতকগুলা হাঁস ও মুরগি কেনাও হইয়াছিল ; কিন্তু শেষে দেখা গেল যে তাহাদের ডিম ত পাওয়াই যায় না ; অধিকন্তু তাহাদের সংখ্যা দিন দিন কমিতেছে। কতক শেয়ালে খায় কতক বা লোকে চুরি করে। অধিকন্তু আমাদের পাড়া পড়শীদের আমাদের বাগানে মুরগি রাখা সম্বন্ধে বিষম আপত্তি। একদিন একজন হাড়ি তাড়ী খাইয়া আসিয়া হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ হইতে দুই ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়া মুরগি পালনের যে রকম ভীষণ প্রতিবাদ করিয়া গেল তাহাতে তাড়াতাড়ি মুরগি কয়টাকে বেচিয়া ফেলা ছাড়া আর আমাদের উপায়ান্তর রহিল না। হাড়ি বাবুটীর নাম ভুলিয়া গিয়াছি। তা' না হইলে ব্রাহ্মণসভায় লিখিয়া তাঁহাকে একটা উপাধি জোগাড় করিয়া দিতাম।

আমাদের বাজে খরচের মধ্যে ছিল—চা। ওটা না থাকিলে সংসার নিতান্তই ফিকে ফিকে, অনিত্য বলিয়া মনে হইত। বিশেষতঃ বারীন চা বানাইতে সিদ্ধহস্ত। তাহার হাতের গোলাপী চা, ভাঙ্গা নারিকেলের মালায় ঢালিয়া চক্ষু বুজিয়া তারিফ করিতে করিতে খাইবার সময় মনে হইত যে ভারত উদ্ধারের যে কয়টা দিন বাকি আছে সে কয়টা দিন চা খাইয়াই কাটাইয়া দিতে পারা যায়।

প্রথম দিনেই বারীন আইন জাহির করিয়া দিল যে নিজে রাঁধিয়া খাইতে হইবে। তা ত বটেই ; বাগানের ভিতর ত আর বাহিরের লোককে ঢুকিতে দেওয়া যায় না—বিশেষতঃ পয়সার অভাব। কিন্তু চিরদিন বাড়ীতে মায়ের হাতের আর মেসে ঠাকুরের হাতের রান্না খাইয়া আসিয়াছি। আজ এ আবার কি বিপদ! পালা করিয়া প্রত্যহ দুই দুই জনের উপর রান্নার ভার পড়িল। সুতরাং আমাকেও মাঝে মাঝে রন্ধন বিদ্যার নিগূঢ় রহস্য লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হইত। কিন্তু ব্রাহ্মণের ছেলে হইলেও ও বিদ্যাটা কখনও বড় বেশী আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই।

থালা, ঘটী, বাটীর নাম গন্ধ বাগানে বড় বেশী ছিল না। প্রত্যেকের এক একটা নারিকেল মালা আর একখানা করিয়া মাটীর সানকি ছিল ; তাহাই আহারাদির পর ধুইয়া মুছিয়া রাখিয়া দিতে হইত। কাপড় সকলেই নিজের হাতে সাবান দিয়া কাচিয়া লইত ; যাহারা একটু বেশী বুদ্ধিমান, তাহারা পরের কাচা কাপড় পরিয়াই কাজ চালাইয়া দিত।

ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশের নানা জেলা হইতে প্রায় ২০জন ছেলে আসিয়া জুটিল। তাহাদের মধ্যে ৫।৭ জন অধিকাংশ সময় কাজকর্ম্ম লইয়া থাকিত ; আর যাহারা বয়সে একটু ছোট তাহারা প্রধানতঃ পড়াশুনা করিত। পড়াশুনার মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্র, রাজনীতি ও ইতিহাস চর্চ্চা, আর কর্ম্মের মধ্যে বিপ্লবের আয়োজন। অনেক রকম ছেলে আসিয়া আমাদের কাছে জুটিয়াছিল। কলেজী বিদ্যার হিসাবে কেহ বা পণ্ডিত, কেহ বা মূর্খ, কিন্তু এখন মনে হয় যে অনন্যসাধারণ একটা কিছু সকলেরই মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইস্কুলের মাষ্টার মহাশয়দের কাছে যে সব ছেলে পড়া মুখস্থ করিতে না পারিয়া লক্ষ্মীছাড়া বলিয়া গণ্য, অনেক সময় দেখিয়াছি তাহারা মনুষ্যত্ব হিসাবে "ভাল ছেলেদের" চেয়ে ঢের বেশী ভাল। ইংরাজীতে যাহাকে adventurous বলে, আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনে সে রকম ছেলের স্থান নাই! ঘ্যান ঘ্যান করিয়া পড়া মুখস্থ করা তাহাদের পোষায় না ; কাজে কাজেই তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্যজ্যপুত্র। কিন্তু যেখানে জীবন মরণ লইয়া খেলা, যেখানে আমাদের ভাবী ডেপুটী-মার্কা ছেলেরা এক পা আগাইয়া গিয়া দশ পা পিছাইয়া আসে, সেখানে ঐ "দস্তি" "বয়াটে" "লক্ষ্মীছাড়া" ছেলেগুলাই হাসিতে হাসিতে কাজ হাসিল করে।

বাগানে ছেলেদের বারীনের কাছে রাখিয়া দেবব্রত ও আমি আর একবার আশ্রমের উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে বাহির হইলাম। দেবব্রতর তখন বাগানের কাজকর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিছু ছিল না ; কিন্তু তাহার মনটা তীর্থস্থানে সাধু দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল ; কাজ কর্ম্ম তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না।

প্রথমেই গিয়া আলাহাবাদে একটা প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালায় দুই চারিদিন পড়িয়া রহিলাম। বাজারের পুরি কিনিয়া খাই, আর লম্বা হইয়া পড়িয়া থাকি। মাঝে মাঝে এক একবার উঠিয়া এ সাধু ও সাধুর কাছে ঢু মারিয়া বেড়াই। মাঝে একজন স্থানীয় বন্ধু জুটিয়া আমাদের 'ঝুসি' দেখাইতে লইয়া গেলেন। সেখানে দেখিলাম গঙ্গার ধারে শিয়ালের মত গর্ত্ত খুঁড়িয়া দুই চারিজন সাধু সেই গর্ত্তের মধ্যে বাস করিতেছেন। এক জায়গায় দেখিলাম একটী সিন্দুর মাখান রাম মূর্ত্তি ; সম্মুখে ভক্ত প্রদত্ত চার পাঁচটী পয়সা, আর পাশেই একটী ছাইমাখা সাধু হাঁপানিতে ধুঁকিতেছেন। শুনিলাম মাটীর নীচে সাধুদের সাধন ভজনের জন্য অনেকগুলি ঘর আছে ; কিন্তু আমাদের বন্ধুটীর নিকট সাধনের যে রকম বীভৎস বর্ণনা শুনিলাম তাহাতে দেবব্রতরও সাধু দর্শনের আগ্রহ অনেকটা কমিয়া গেল।

প্রয়াগ হইতে বিন্ধ্যাচলে আসিয়া এক ধর্ম্মশালায় কিছুদিন পড়িয়া রহিলাম। মাঠের মাঝখানে একখানি ছোট কুঁড়েঘর বাঁধিয়া এক জটাজুটধারী বাঙ্গালী সাধু সেখানে থাকেন। প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে বসিবামাত্র তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল তত্ত্বকথা ও থুথু সমান বেগে ছুটিতে লাগিল। বাবাজী আহারাদির কোনও চেষ্টা করেন না; তবে তাঁহার কাছে ভক্তেরা যা প্রণামী দিয়া যায়, তাঁহার একজন গোয়ালা ভক্ত তাহা কুড়াইয়া লইয়া গিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সাধুকে দুধসাগু তৈয়ার করিয়া দেয়। ঐ দুধসাগু খাইয়াই তিনি জীবনধারণ করেন। থুথু ও তত্ত্বকথা সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিয়া দেখি এক গেরুয়া পরিহিতা, ত্রিশূলধারিণী ভৈরবী আমাদের কম্বল দখল করিয়া বসিয়া আছেন। দেবব্রত ব্রহ্মচারী মানুষ, স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে বসে না; সে ত ভৈরবীকে দেখিয়া প্রমাদ গণিল। এই সন্ধ্যার সময় তাহার পর্ব্বত প্রমাণ বিপুল দেহ-ভার লইয়া বেচারা কম্বল ছাড়িয়া যায়ই বা কোথায়? ভৈরবীর আপাদ মস্তক দেখিয়া দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি চান?

ভৈরবী—"আমি সাধুসঙ্গ করতে চাই।"

দেবব্রত—"সাধুসঙ্গ করতে চান, ত আমাদের কাছে কেন? দেখছেন না আমরা বাবুলোক; আমাদের পরণে ধুতি, চোখে সোণার চশমা?"

ভৈরবী—"তা হোক, আমি জানি আপনারা ছদ্মবেশী সাধু।"

ভৈরবী ঠাকুরুণ সেখান হইতে নড়িবার কোনই লক্ষণ দেখাইলেন না। শেষে অনেকক্ষণ তর্কবিতর্কের পর দেবব্রতই রণে ভঙ্গ দিয়া সে রাত্রি এক গাছ-তলায় পড়িয়া কাটাইয়া দিল।

কিন্তু ভৈরবী হইলে কি হয়, বাঙ্গালীর মেয়ে ত বটে! সকাল বেলা ঘুরিয়া আসিয়া দেখি, কোথা হইতে চাল ডাল জোগাড় করিয়া ভৈরবী রান্না চড়াইয়া দিয়াছেন। বেলা ১০টা না বাজিতে বাজিতে আমাদের জন্য খিচুড়ী প্রস্তুত। কামিনী-কাঞ্চনে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে, কিন্তু কামিনীর রান্না খিচুড়ী সম্বন্ধে শাস্ত্রের ত কোন নিষেধ নাই; সুতরাং আমরা নির্ব্বিবাদে সেই গরম গরম খিচুড়ী গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলাম। আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে তবে ভৈরবী আহার করিতে বসিলেন। দেখিলাম বাঙ্গালীর মেয়ের স্নেহ-ক্ষুধাতুর প্রাণটুকু গৈরিকের ভিতর দিয়াও ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

বিন্ধ্যাচল হইতে চিত্রকুটে আসিলাম। ষ্টেসনে নামিতে না নামিতে ছোট বড় মাঝারি অনেক রকমের পাণ্ডা আমাদের উপর আক্রমণ করিল। আমরা

যে তীর্থ দর্শন করিয়া পুণ্য-সঞ্চয়ের বুদ্ধি হইতে চিত্রকুটে আসি নাই, এ কথা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে অনেকক্ষণ বক্তৃতা দিয়া তাহাদের বুঝাইলাম। কিন্তু তাহারা ছিনেজোঁকের মত আমাদের সঙ্গে লাগিয়াই রহিল। তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় আমরা পাণ্ডাদের আস্তানা ছাড়িয়া নদীর ধারে একটা পোড়ো ঠাকুরবাড়ীতে আসিয়া আড্ডা গাড়িলাম। কিন্তু পাণ্ডাদের অদ্ভুত অধ্যবসায়! পাঁচ সাতজন আমাদের ঘিরিয়া বসিয়া রহিল। তীর্থে আসিয়া ঠাকুর দর্শন করে না—এ আবার কেমন তীর্থযাত্রী! তিন চার ঘণ্টা বসিয়া থাকিবার পর গালি দিতে দিতে একে একে সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল—কেবল একটী ১০।১২ বছরের ছোট ছেলে নাছোড়বান্দা। সে তখনও বক্তৃতা চালাইতে লাগিল। একখানি হাত আপনার পেটের উপর রাখিয়া আর একখানি হাত দেবব্রতর মুখের কাছে ঘুরাইয়া বলিল—"দেখ, বাবু—যে জীবাত্মা, সেই পরমাত্মা। আমাকে খাওয়ালেই তোমার পরমাত্মার সেবা করা হবে।" পেটের জ্বালার সঙ্গে পরমার্থের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা শুনিয়া দেবব্রত হাসিয়া ফেলিল। বলিল—"দেখ্, তোর কথাটার দাম লাখ টাকা। তবে আমার কাছে এখন অত টাকা নেই বলে তোকে এ যাত্রা একটা পয়সা নিয়েই বিদায় হতে হবে।"

যে ঠাকুর বাড়ীতে আমরা পড়িয়া রহিলাম, তাহার চারিদিকে গাছে গাছে বানর ছাড়া আর কোন জীবের দেখা সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত না। সেখান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে রেওয়ার রাজা বৈষ্ণব সাধুদের জন্য একটা মঠ তৈয়ারি করিয়া দিয়াছেন। সেখানে "আচারী" ও "বৈরাগী" প্রধানতঃ এই দুই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব সাধুরা থাকেন। তাঁহাদের দুই একজনের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হইত।

একদিন সকাল বেলা বসিয়া আছি এমন সময় সেখানে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। তিনি যুবা পুরুষ; বয়স আন্দাজ ৩২।৩৩; পরিচয়ে জানিলাম তাঁহার জন্মস্থান গুজরাত; তাঁহার গুরুর আদেশ অনুযায়ী এই অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ান। আমাদের যে রাজনীতির সহিত কোনও সম্পর্ক আছে তাহা তিনি কি করিয়া টের পাইলেন, ভগবানই জানেন। দুই একটা কথার পরই তিনি আমাদের বলিলেন—"দেখ, তোমরা যে মনে কর, এ অঞ্চলের লোক দেশের অবস্থা বুঝেনা—সেটা মিথ্যা। সময় আসিলে দেখিবে ইহারাও ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হইয়া আছে।" আমরা কথাটা চুপ করিয়া শুনিলাম—

দেখি শ্রাদ্ধ কোন্ দিকে গড়ায়। তিনি বলিতে লাগিলেন—"দেখ, তোমাদের একটা কথা বলিয়া রাখি। বিশ্বাস কর ত কথাটা খুবই বড়, আর না কর ত বাজে কথা বলিয়া ফেলিয়া দিও। জগতে ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনের জন্য ভগবান আবার অবতীর্ণ হইয়াছেন; তবে এখনও প্রকট হন নাই। তাঁহাকে নরদেহে টানিয়া আনিবার জন্যই যোগীদের সাধনা; সে সাধনা এবার সিদ্ধ হইবে। ভারতের দুঃখ তখনই ঘুচিবে।"

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি এ সংবাদ জানিলেন কিরূপে?"

সন্ন্যাসী বলিলেন "আমি সন্ন্যাস লইবার পূর্ব্বে হনুমানজীর সাধন করিতাম। অনেক সাধন করিয়া কোন ফল না পাওয়ায় একবার নিরাশ হইয়া দেহত্যাগ করিতে যাই। সেই সময় হনুমানজী আমার নিকট প্রকাশিত হইয়া এই আশার সংবাদ আমাকে দিয়া জান।" ব্যাপারটা সন্ন্যাসীর মাথার খেয়াল, কি ইহার মূলে কোন সত্য আছে তাহা ভগবানই বলিতে পারেন।

সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া আমরা একবার অমরকণ্টক যাইব স্থির করিলাম। বিন্ধ্য পর্ব্বতের যেখান হইতে নর্ম্মদার উৎপত্তি, অমরকণ্টক সেইখানে। কোন্ ষ্টেসনে নামিয়া কোথা কোথা দিয়া যে সেখানে গিয়াছিলাম এই দীর্ঘকাল পরে তাহার সবই ভুলিয়া গিয়াছি। শুধু মনে আছে যে রাস্তায় একজন আসামী ভদ্রলোকের বাড়ী অতিথি হইয়া দিন দুই বেশ চব্যচোষ্য আহার করিয়াছিলাম। বিন্ধ্য পর্ব্বতটা কিন্তু আমাদের ভাল লাগিল না। পাহাড়টা কেমন নেড়া নেড়া মনে হইতে লাগিল। শৃঙ্গসম্বলিত হিমালয়ের কেমন একটা প্রাণকাড়া সৌন্দর্য্য আছে; বিন্ধ্যাচলের তাহার নামগন্ধও নাই। তিন চার দিন চড়াই উৎরাই এর পর যখন অমরকণ্টকে পৌঁছিলাম, তখন দেখিলাম উহা আশ্রমের উপযুক্ত স্থান একেবারেই নয়। চারিদিকে শুধু বনজঙ্গল আর মাঝখানে একটা ভাঙ্গা ধর্ম্মশালায় জনকয়েক রামায়ৎ সাধু বসিয়া গাঁজা খাইতেছে। যেখানে পাহাড় হইতে বুদ্ বুদ্ করিয়া নর্ম্মদার ধারা বাহির হইতেছে সেখানে নর্ম্মদা দেবীর একটা ছোট মন্দির আছে; তাহাও সংস্কারাভাবে নিতান্তই জীর্ণ। অমরকণ্টক এক কালে যে বৌদ্ধদিগের তীর্থ ছিল তাহার নিদর্শন এখনও সেখানে বর্ত্তমান। ব্রহ্মদেশীয় পাগোদার মত অনেকগুলি কাঠের মন্দির সেখানে রহিয়াছে। কোন কোনটীর মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি এখনও প্রতিষ্ঠিত, কোথাও বা অন্য সম্প্রদায়ের সাধুরা বুদ্ধমূর্ত্তি সরাইয়া দিয়া রাম বা কৃষ্ণ মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। চারিদিকে শালবন, সেখানে বাঘের দৌরাত্ম্যও যথেষ্ট। আশপাশের গ্রাম হইতে গরু ছাগল প্রায়ই

বাঘে লইয়া যায়। যখন দুই চারজন মানুষকে লইয়া বাঘে টানাটানি করে তখন রেওয়া রাজ্যের সিপাহীরা এক শ' বৎসর আগেকার মুঙ্গেরী বন্দুক লইয়া গোটা দুই ফাঁকা আওয়াজ করিয়া কর্ত্তব্য পালন করে। সাধারণ লোকেদের ও বাঘের হাতে মরা সহিয়া গিয়াছে। জঙ্গলে ঢুকিবার আগে তাহারা বাঘের দেবতার পূজা দেয়, তাহার পরেও যদি বাঘে ধরে, ত সেটাকে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের উপর বরাত দিয়া নিশ্চিন্ত হয়। সাধুদেরও সেই অবস্থা; তবে তাঁহারা নর্ম্মদা পরিক্রম করিতে বাহির হইবার সময় প্রায়ই দল বাঁধিয়া বাহির হন। এই নর্ম্মদা-পরিক্রম আমার বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হইল। অমরকণ্টক হইতে আরম্ভ করিয়া পদব্রজে নর্ম্মদার ধারে ধারে গুজরাত পর্য্যন্ত যাইতে ও গুজরাত হইতে পুনরায় নর্ম্মদার অপর পার ধরিয়া অমরকণ্টকে ফিরিয়া আসিতে চার পাঁচ বৎসর লাগে। কোন কোন স্ত্রীলোককে গণ্ডি খাটিতে খাটিতে নর্ম্মদা পরিক্রম করিতে দেখিয়াছি।

অমরকণ্টকের চারিধারে ১০।১২ ক্রোশ পর্য্যন্ত বনে জঙ্গলে ঘুরিলাম, কিন্তু আমাদের আশ্রমের উপযোগী স্থান কোথাও মিলিল না। পাহাড় হইতে অগত্যা নামিতে হইল। নামিয়াই দেখিলাম—বারীনের চিঠি বলিতেছে "শীঘ্র ফিরিয়া এস।"

ব্রাহ্মণ।

(শ্রীসতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

বিশ্বের দুয়ারে আজি হে নিঃস্ব ব্রাহ্মণ!
বৃথা কেন শোক কর ব'সে,
ভেবে দেখ নিঃস্ব তুমি কিসে!
অনন্ত জ্ঞানের খনি হৃদয় তোমার,
অনন্ত ত্যাগের ফল প্রাণ,
সেই তুমি—ত্যাগাদর্শ জগতের,
চাহ কার দান?

শূন্যের অনন্ত পথে হে পুণ্য-ব্রাহ্মণ !
উঠেছিল আশ্বাসের গান,
তুমি—তুমি—তুমি তার প্রাণ।
লক্ষ্যভ্রষ্ট ছুটেছিল ব্যাকুলা ধরণী,
বেঁধে দিলে সূক্ষ্ম প্রেম ডোরে,
সেই তুমি—প্রেমাদর্শ জগতের,
ভাস আঁখি লোরে !

বনানী বাছিয়া নিলে হে জ্ঞানী ব্রাহ্মণ,
শম-দম-তপঃ শৌচ ক্ষমা—
তুমি মাত্র তোমার উপমা।
ক্ষত্রে প্রদানিলে তুমি সসাগরা ধরা,
ভিক্ষাবৃত্তি জীবিকা তোমার,
সেই তুমি—জ্ঞানাদর্শ জগতের,
কেন মোহ-ভার !

ধর্ম্মের আসনে বসি' হে কর্ম্মী-ব্রাহ্মণ,
জগতের শিক্ষা দিলে দান,
কৈবা আছে তোমার সমান ?
তোমার কর্ম্মের ফল বৈশ্যে সমর্পিয়া,
ধর্ম্মমাত্র আশ্রয় তোমার,
যেই তুমি—ধর্ম্মাদর্শ জগতের,
কি অভাব তার !

শক্তির ভাণ্ডার তুমি হে মুক্ত ব্রাহ্মণ,
শক্তি নিজে শক্তি ভিক্ষা করে,
বসে আছ কাহার দুয়ারে !
সেবাব্রত প্রচারিলে শক্তির সন্ধান,
শূদ্র তার ফল মধুময়,
সেই তুমি—সেবাদর্শ জগতের,
কর কার ভয় !

হে কর্ম্মী, হে জ্ঞানী ত্যাগী, হে মুক্ত ব্রাহ্মণ !
বারেক উঠিয়া দেখ চেয়ে,
তোমারি সাধনা ফলে জেগেছে ধরণী,
তুমিই উজানে গেছ বেয়ে !

প্রতিবাদ।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।)

A Seeker after truth and Helper of his comrades
Thy charity extend, if not thy ear, friend—"

আশ্বিনের 'ভারতবর্ষে' শ্রদ্ধেয় শ্রীযুৎ জগদানন্দ রায় মহাশয়ের নাম স্বাক্ষরিত 'ভৌতিককাণ্ড'-শীর্ষক প্রবন্ধ দেখে পরম উৎসাহে পড়তে আরম্ভ করলাম—এই আশায় যে প্রেতত্ব যখন পাশ্চাত্যদেশের মনীষী বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা বহুকাল যাবৎ বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলোচিত হচ্চে, তখন আমাদের দেশের একজন জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-লেখক নিশ্চয়ই কিছু নূতন তত্ত্বের সন্ধান দেবেন। কিন্তু প্রবন্ধটী পড়া শেষ করে বুঝলাম, রায় মহাশয়ের উদ্দেশ্য নয়, কোনো নূতন তত্ত্বের খবর দেওয়া; উদ্দেশ্য হচ্চে এ জাতীয় আলোচনাকে মামুলি-যুক্তিতে বিদ্রূপ করে, হেসে উড়িয়ে দেওয়া। কাজেই খুব নিরাশ হলাম; শুধু নিরাশ বল্লে সব কথা খোলসা করে বলা হয় না; খুবই ব্যথিত হলাম; এবং রায় মহাশয়ের হাসিঠাট্টার সুর দেখে একটু রাগলামও বটে—যদিচ সে রাগে তাঁর কিছু এসে যাবে না, আমারই ঘরের ভাতের ধ্বংস হবে!

দুঃখ হল মনীষি বৈজ্ঞানিক সার অলিভারের প্রাণপণ সত্যসাধনাকে লক্ষ্য করে তিনি ব্যক্তিগত বিদ্রূপ করেছেন! এবং তাঁর জীবনব্যাপী আলোচনা গবেষণাকে তুচ্ছজ্ঞান করে তাঁর বিশ্বাস বা মতকে ব্যক্তিগত জরাদৌর্ব্বল্যের লক্ষণ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। জগদানন্দ বাবু যে ইচ্ছা করে এই প্রবীণ সত্যসাধককে ঠাট্টা করেছেন তা মনে হয় না; এ তাঁর অজ্ঞতা ও নিজ বিশ্বাসের প্রতি অতি-শ্রদ্ধার ফল। একটা বিরুদ্ধ মতকে ঠাণ্ডামেজাজে শিষ্ট আইনে আলোচনা করবার মত মনের উদারতা ও ধৈর্য্যের অভাব অনেক গুণী জ্ঞানীরই কাজে ও কথায় দেখা যায়; রায় মহাশয়কেও আমরা এই শ্রেণীর সমালোচক

ভাবে দেখবো সে আশা করিনি বলে তাঁর প্রবন্ধের ধরণে আরো ক্ষুন্ন হয়েছি। আমি অন্ততঃ এইটুকু তাঁর কাছে আশা করেছিলাম যে, সাধারণ দরের লোকের চেয়ে গুণী-জ্ঞানী সত্যকামী ধরাপূজ্য পণ্ডিতদের মত বিশ্বাস সম্বন্ধে লিখিত পরিচয় দিতে গেলে তিনি একটু সাবধানে ভেবে চিন্তে কথা বলবেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। আমরা নির্দ্দোষভাবে অনেক সময় মহাজনদের কাজ-কর্ম্ম নিয়ে হাস্যরহস্য করতে গিয়ে তাঁদের প্রতি বড় অবিচার করে বসি, এবং সত্যপ্রচারের পক্ষেও বড় ক্ষতি করে বসি। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে হয়তো রায় মহাশয়ের একটা স্বভাব বা সংস্কারগত বিরাগ আছে; তা থাকতে পারে, অনেকেরই আছে ও ছিল; কিন্তু নিজের জন্মগত সংস্কারের খাতিরে একটা আধুনিক আলোচ্য তত্ত্বকে হেসে উড়িয়ে দিতে গিয়ে জ্ঞানবন্ধু সত্যপিপাসু পণ্ডিতকে বিদ্রূপ করাটা খুব রুচিসংগত কাজ বলে মনে হয় না।—রায়মহাশয় প্রবন্ধ শেষে মত প্রকাশ করেছেন—পুত্রশোকাতুর জরা জীর্ণ বুড়া লজের মতিগতি এখন সান্ত্বনার আশায় ভূতের আশ্রয় লইতেছে।

কিরূপ মানসিক তর্কপ্রণালী অবলম্বন করে যে রায়মহাশয়—সার অলিভারের প্রেতবাদে বিশ্বাস নিয়ে এ রকম সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন তা বোঝা খুব শক্ত নয়। তর্কপ্রণালীটী হচ্চে এই যথা—'ভূতে প্রেতে বিশ্বাসটা অজ্ঞানী কুসংস্কারীর ধর্ম্ম, সভ্য শিক্ষিত, উন্নত লোকের শোভা পায় না, বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের পক্ষে; পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পড়ে ভূতপ্রেতে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস খুবই লজ্জার কথা; মানসিক অপভ্রংশ, বা বুদ্ধিবিকার না হলে এমন মতিগতি হয় না; তা যদি হয় তবে লজ্ একজন বৈজ্ঞানিক হয়ে ভূতে বিশ্বাস করলেন কেন? ঘোর সমস্যা বটে! লজ্ যে একজন বড়দরের বৈজ্ঞানিক তার ভুল নেই; আবার ভূতে বিশ্বাসবান্, তারও ভুল নেই; এখন এমন কেন হল? লজ যে বিজ্ঞানের ও বৈজ্ঞানিক জগতের মুখে কালি দিয়ে বস্‌লেন! কি করে বিজ্ঞানের Prestige বাঁচানো যায়—এই হল রায়মহাশয়ের মনোগত সমস্যা! বিজ্ঞানের মুখ রক্ষা করতে গেলে বলতে হয়—'হয় লজ বৈজ্ঞানিক নয়' না হয় তাঁর Senile decayর বা পুত্রশোকের ধাক্কায় মতিগতি বিকল হয়েছে। কিন্তু লজ বড় বৈজ্ঞানিক অস্বীকার করা যায় না, ergo প্রতিপন্ন হচ্চে বৃদ্ধবয়সে পুত্রশোকে তাঁর এমন দুর্গতি ঘটেছে।'

সার অলিভারের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে রায় মহাশয় যে সিদ্ধান্ত করেছেন সে গুঢ় তত্ত্বটী আমিও রায়মহাশয়ের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেই পেয়েছি। কারণ

একজনের কাজের কারণ নির্ণয় দূর হতে আর একজনকে করতে হলে তাঁর মনস্তত্ত্ব-সাগরে ডুব দিতে হবেই।

আর রায়মহাশয়ের উদ্দেশ্যই যে বিজ্ঞানের মুখরক্ষা তা বোঝা যায় এই হতে যে তিনি লজ সাহেবকেই বাঁচাতে ব্যস্ত। সার কনান্ ডয়েলের প্রেতবিশ্বাস নিয়ে মাথা ঘামান নাই; কারণ সম্ভবতঃ এই, যে ইনিতো কল্পনা-কুশল গল্প লেখক, স্বভাবে খেয়ালী; ওঁর বিশ্বাস অবিশ্বাসে বিজ্ঞানের লাভ ক্ষতি নাই।

সে যাক। লজ সাহেবের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি যে দায়িত্ব-হীন উক্তি করেছেন, সেরূপ দায়িত্বহীন উক্তি অন্ততঃ নির্দ্দোষ রহস্যচ্ছলে করা হলেও অনেক সময় বড় অপ্রিয় ফলের ও তর্কের অবতারণা হয়। আমার মনে হয় এই কথা কটীতে রায়মহাশয় খুব সম্ভব না জেনে দুটী অপরাধ করেছেন; প্রথম সার অলিভারের মত প্রবীণ নিঃস্বার্থ বিজ্ঞানবন্ধুকে একটা ব্যক্তিগত স্বার্থের বশীভূত হওয়ার দোষে দুষী করেছেন। দ্বিতীয় একটা নূতন সত্য বা তত্ত্বের রহস্যভেদের বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টাকে হেয় জ্ঞান করেছেন—আমি যদি এই অনুমান ভুলভাবে করে থাকি তাহলে রায়মহাশয় আমায় মাফ্ করবেন। তবে কেন যে আমি এই দুই সিদ্ধান্ত করলাম তার কারণ দেখাচ্ছি।

আমার প্রথম সিদ্ধান্ত রায় মহাশয়ের নিজ উক্তির উপর নির্ভর করেই হয়েছে। সরল ভাষার সিধা অর্থ ধরে মানে করলে তাঁর লিখিত উক্তি হতে অন্য কোনো সিদ্ধান্ত হয় না। যে কেউ এটা পড়েছেন তিনিই এমনি বুঝেছেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত আমার প্রথমেরই করোলারী। কোনো এক নিরপেক্ষ তত্ত্ব-অনুসন্ধিৎসুকে হীন স্বার্থ দ্বারা গবেষণায় নিযুক্ত বলে দোষারোপ করলে প্রকারান্তরে সেই তত্ত্ব উদ্ঘাটনের পথে বাধা দেওয়া হয়। যাঁরা সত্যই এই ব্যাপারটা বুঝতে চান তাঁরা যদি আমার প্ররোচনায় বিশ্বাস করেন যে আমি অন্ধ সংস্কারের বশবর্ত্তী বা স্বার্থের লোভে, সুখের লোভে এই তত্ত্ব আলোচনা করছি, তা হলে উৎসুক ব্যক্তিরা স্বতঃই এই তত্ত্বে শ্রদ্ধাহীন হবেন। কাজেই যেখানে একজনের জীবনব্যাপী চেষ্টার ফলে একটা অজ্ঞাত জ্ঞান রাজ্যের রহস্য প্রকাশ হবার নিস্বার্থ চেষ্টা হচ্চে এবং চেষ্টা সফল হলে মানুষের জ্ঞান বাড়বে, সেখানে সেই লোক বা তাঁর চেষ্টা সম্বন্ধে আমাদের পারতপক্ষে খুব সাবধানী ও শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়াই উচিত।

রায় মহাশয় স্বমুখেই স্বীকার করেছেন যে যে বিষয়ে লজ, ক্রুক্স্ ওয়ালেস্, জেমস্, সেজউইক প্রভৃতি বিজ্ঞানধুরন্ধরেরা তদ্গত তন্ময় হয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন, সে বিষয় হেসে উড়িয়ে দেবার মত জিনিস নয়; আর হেসে উড়িয়ে দেওয়ার দিনও নেই। রায় মহাশয় নিশ্চয়ই খপর রাখেন যে, পাশ্চাত্য দেশের যাবতীয় পণ্ডিতরাই হেসে উড়িয়ে না দিয়ে স্বচেষ্টায় একটা বৈজ্ঞানিক সভা করে আজ ৩০বৎসর যাবৎ এই তত্ত্ব আলোচনা করেছেন। আর আলোচনা সভার কাজ লোক চক্ষুর বা জ্ঞানের অন্তরালেও হচ্চেনা, প্রকাশ্য ভাবেই হচ্চে!—এবং observation ও experiment এই দুই বিজ্ঞান সঙ্গত উপায়েই আলোচনা গবেষণা হচ্চে—ফাঁকি জুয়োচুরী বা লোক ঠকানোর উদ্দেশ্যে নয়। এবং রায় মহাশয় এও জানেন যে ঐ দুই উপায়ে (Obs. & Exp) প্রাপ্ত fact সত্য বলে সিদ্ধান্ত হলে বৈজ্ঞানিকরা তাদের কারণ নির্ণয় জন্য একটা Hypothesis করেন, এবং যে Hypothesis দিয়া বেশী ভাগ সত্য ঘটনা প্রাকৃতিক নিয়মে সহজ ভাবে ব্যাখ্যাত হয় তাকেই working hypothesis বলে গণ্য করা হয়। পরে নূতন facts আবিষ্কৃত হলে এবং উক্ত মতে ব্যাখ্যাত না হলে সেটাকে অগ্রাহ্য করা হয়। তিনি বিজ্ঞানাচার্য্য, তাঁকে এসব কথা শোনানো আমার ধৃষ্টতা মাত্র, তবে নিজের কথা পরিষ্কার করে বলতে হচ্চে বলে এসব কথা। অলৌকিক এই সব ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে গবেষণা কারী পণ্ডিতেরা দুটী Hypothesis খাড়া করেছেন। প্রথম :—Telepathy অতীন্দ্রিয় উপায়ে ভাব চালনা। দ্বিতীয়—প্রেতঘটিত (Spirit Hypothesis)। সাইকিক্যাল রিসার্চ্চকারীরা উপস্থিত দুইদলে বিভক্ত। একদল (অল্প সংখ্যক) Telepathy মতের সমর্থক। দ্বিতীয় দল প্রেতবাদী, ইহারা সংখ্যায় বহু। সার অলিভার এই দ্বিতীয় দলভুক্ত। উপরন্তু আজ ৩০ বৎসরেরও অধিক কাল হতে তিনি এই মতের সমর্থক। তিনি তখন মাত্র ৪০ কি ৩৫ বৎসর বয়স্ক। তখন তিনি পুত্র শোকাতুর হন নাই।

১৯১১ সালে প্রকাশিত তাহার Survival of Man নামক গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—"The first thing we learn, perhaps the only thing we clearly learn in the first instance is Continuity, etc. page 339। তাঁহার পুত্র রেমণ্ড ১৯১৫ সালে বর্ত্তমানযুদ্ধে মারা যান।

রায় মহাশয় একটু কষ্ট স্বীকার করে যদি অলিভার লজের রচিত গ্রন্থ গুলি বা প্রেততত্ত্ব সভার বিবরণী গুলি অপাঠ্য বলে অগ্রাহ্য না করে পড়েন তা হলে বুঝবেন প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস পুত্রশোকাতুর বুড়া লজের ভীমরতি নয়, পক্ষান্তরে বহু বর্ষব্যাপী ধীর গবেষণার ফল।

কোনো একটা নূতন মত আমার বুদ্ধির ধারণাতীত বলে বা হাল-ফ্যাশান অনুযায়ী নয় বলে যদি না মানি তাহলে আমি আমার প্রকৃষ্ট বুদ্ধির নিজে তারিফ করতে পারি, অন্য সত্যপ্রিয় বিবেচকরা তা করবেন না।

আর এক কথা বুড়া লজের ভীমরতি বা বুদ্ধিবিকার হলেও আর যত উক্ত মতাবলম্বী পণ্ডিতাগ্রগণ্য আছেন তাঁরাও কি ঐ রকম সব একটা স্বার্থের আশ্বাসে বা বিকৃত বুদ্ধিফলে এই মত মেনেছেন? আবার কেমন সব পণ্ডিত? যাঁরা জড় বিজ্ঞান শাস্ত্রের এক রকম জন্মদাতা বল্লেই হয়! রাসেল, ওয়ালেস্, উইলিয়ম ক্রুক্স, লম্ব্রসো, রিসেট্, লর্ড র‍্যালে সব বিজ্ঞান ধুরন্ধর! দার্শনিক-রাজ হাঁরি বারস্, সেজ উইক, উইলিয়ম জেমস্, এঁরাও কি বিকৃতবুদ্ধি? আমরা নকল ভাষায় যাঁদের বই পড়ে বিশ্ব বিদ্যালয়ের শুধু তকমা পেয়েছি এ-হেন আমরা যখন ও-হেন পণ্ডিতদের মতামত নিয়ে রহস্য বিদ্রূপ করবো তখন আমাদের উচিত একটু ভেবে চিন্তে মত প্রকাশ করবো! জোর আমি বলতে পারি, "সার লজ্ বা অমুকের সিদ্ধান্তটা তেমন মনে ঠেক্ছেনা। আমি সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ ভাল করে ওজন করে এ সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না"। এর বাইরে আমি যদি যাই বা কিছু বলি এবং অবহেলা করে বলি তা হলে লোকে আমার বুদ্ধির বা রুচির বাহবা দেবে না নিশ্চই।

আবার কেমন ধরণে গ্রাহ্য এই সব Evidence? Times পত্রিকার এক লেখক বলছেন "The standard of evidence required by Psychical Researchers is about five times stricter than that required to hang a man for murder. Mr. Podmores' standard is several degress stricter than that!" Dr. Haldar, Psy. Re. Page 6.

এমনি ভাবে ওজন করা হাজার হাজার evidence এই সভা সংগ্রহ করেছেন। এই সব evidence লব্ধ fact কোনো যথার্থ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অগ্রাহ্য করতে পারেন না। এমনি ভাবে পরীক্ষিত সব সত্য ঘটনাকে কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জন্ম-সন্দেহবাদী দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা বিদেহ-আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন! অতঃপর আমি সে সব মানিনি

বল্‌লে প্রকারান্তরে দুটী কথা বলা হয়; প্রথম আমি অভ্রান্ত সর্ব্বজ্ঞ—দ্বিতীয় আমি ছাড়া আর সব পণ্ডিত হয় বোকা, অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন না হয় ইচ্ছাকরে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক। যদি আমার সর্ব্বজ্ঞ-আমি অভ্রান্ত হন তা হলে অবশ্য অপর যে সব 'তুমি' 'তিনি' তাঁরা মিথ্যাবাদী বা ভুলবাদী। এখন পাঠকদের ওপর ভার এইটীর সত্য নির্ণয় করা যে সারাজীবন ধরে হাতে কলমে যে সব পণ্ডিত পরীক্ষা করছেন তাঁরা ভুল করছেন, কি উদাসীন আনাড়ী আমি ভুল করছি।

কেহ যদি আত্ম সমর্থনের জন্য বলেন এই সভার সংগৃহীত ঘটনাগুলা বা সাক্ষ্যপ্রমাণ গুলা যে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ তার প্রমাণ কি? উত্তরে এই বক্তব্য যে এই সভায় এমন সব নামজাদা সভ্য আছেন যাঁরা প্রেতবাদ আদৌ মানেন না, যাঁদের attitude ঘোর সন্দেহ বা অবিশ্বাসের—এমন সব লোকের চোখে ধুলা দিয়ে কাজ করবার সাহস প্রবৃত্তি বা শক্তি কারো হতে পারেনা—বিশেষ যখন গণ্যমান্য সত্যপিপাসু পণ্ডিতদের নিয়ে এই সভা।

রায় মহাশয় কি বল্‌তে চান জানিনা। তাঁর যদি মনোগত ভাবটা এই হয় যে লজ বা কনান ডয়েল প্রভৃতির credulity অতিমাত্রায়; কেবল বিশ্বাস করবার ঝোঁকেই বিশ্বাস করেন, তা হলে তিনি সমস্ত তত্ত্ব না জেনে এদের উপর অবিচার করেছেন।

তিনি নিজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক, অন্ততঃ বৈজ্ঞানিক তর্কে প্রেতবাদটা যে মিথ্যা বা ন্যায়সঙ্গত নয় প্রমাণ করতে গেলে তাঁকে এর বিরুদ্ধে বিশ্বাক্ষ্য সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করতে হত; পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধের অন্ধ আশ্বাস বিশ্বাস বলে বিদ্রূপ করে ওড়ালে তাঁকে কেউ বাহাদুরী দেবে না। সে ক্ষমতা বা তদুপযোগী পড়া শুনা বা সময় যদি তাঁর না থাকে তা হলে তাঁর সম্ভ্রমের সঙ্গে বলা উচিৎ ছিল,—"বিষয় আমি জানিনি শুনিনি কিছু, বা আলোচনা করিনি; অন্ততঃ না জেনে শুনে পণ্ডিতদের জীবনব্যাপী গবেষনার নিতান্ত বিরুদ্ধে কিছু বলতে যাইনি"। বিবেচক লেখকের পক্ষে এই ভাবটাই সমীচীন নয় কি? লজ সাহেব যেন বৃদ্ধ ও পুত্র শোক বিকৃত; কুক্‌স্ ওয়ালেস্, জেমস্, লম্ব্রসো, সার কনান্ ডয়েল এঁরাও কি তাই?

পণ্ডিতপ্রবর কুক্‌স্ উক্ত S. P. R. এর সভাপতি হয়ে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে যে অভিভাষণ করেন তা হতে একটু তুলে দি, রায় মহাশয় ধৈর্য্য ধরে একটু শুনবেন কি?—"Thirty years have passed since I published an account of experiments tending to show that outside our scientific

knowledge there exists a force exercised by *intelligence differing from the ordinary intelligence* common to mortals • • To ignore the subject would be an act of cowardice, an act I feel no temptation to commit—To stop short in any research that bids fair to widen the gates of knowledge, to recoil from fear or adverse criticism is to bring reproach on science. There is nothing for the investigator to do but to go straight on to explore up and down, inch by inch with the taper of reason, to follow the light wherever it may lead, even should it at times resemble a will-o-wisp. I have nothing to retract." সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকপ্রবর Huxleyর জ্ঞানগর্ভ কথাক'টী ভুলবেন না—Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abysses Nature leads."

যথার্থ বৈজ্ঞানিকের এই মনোভাব, আর কার্য্যধারা। এবং প্রবীণ বিজ্ঞানাচার্য্য সার অলিভার এই ভাব ও এই ধারা মনে রেখে ৩০ বৎসরব্যাপী সাবধান গবেষণার পর বল্‌ছেন—"Every kind of alternative explanation including the almost equally unorthodox one of *telepathy from living people* have been tried and these attempts have been perfectly legitimate. If they had succeeded, well and good, but in as much as in my judgment there are phenomena which they cannot explain and in as much as some form of spirit hypothesis given some postulates explains practically all I have found myself driven back on what I may call the commonsense explanation" Raymond page 369.

পাঠক দেখিবেন—সার লজ্ কেবল জ্ঞানের খাতিরে বিশ্বরহস্য ভেদ চেষ্টায় ব্যস্ত; পুত্রশোকাতুর হৃদয়ে আশ্বাস পাবার জন্যে ভূতের আশ্রয় নেন নি, অথচ তাঁর উপর এই মিথ্যা উদ্দেশ্য আরোপ করে রায় মহাশয় একজন নিষ্কাম সত্যসেবীর মর্য্যাদা লাঘব করেছেন মাত্র! আর লজ্ নিজে পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ হলেও ওয়ালেস্ ক্রুক্‌স্, জেমস্, ব্যারেট, মায়ার্স প্রভৃতি মনীষীরা সে রকম কোনো শোকের বাতিকে প্রেততত্ত্বের আশ্রয় নেন নি!

রায় মহাশয় বৈজ্ঞানিক লেখক এবং আচার্য্য, কাজেই তাঁকে আর দুটা ধার করা চোখা কথা না শুনিয়ে থাকতে পারলাম না—কথা আমার নয় ঐ বৃদ্ধ বাতিকগ্রস্ত লজ্ মহাশয়ের,—"Strange facts do really happen even tho' unprovided for in our sciences. Amid their orthodox relations they may be regarded as a nuisance. * * To avoid such alien incursion a laboratory can be locked, but the universe can not."

কোনো একটা অজ্ঞেয় তত্ত্ব হঠাৎ জ্ঞানগোচর হলে এবং তার কার্য্যপদ্ধতি আমাদের rule-and-thumb lineএর দ্বারা ব্যাখ্যাত না হলে আমরা ভারি উত্যক্ত বিরক্ত হয়ে উঠি। এবং নিজেদের 'সর্ব্বজ্ঞ অভ্রান্ত আমি'র উপর আমরা এমনি বেশী বিশ্বাসবান যে প্রমাণসত্ত্বেও তাদের সত্যতা মান্‌তেই চাইনে; অপর কেউ বিশ্বাস করবার কারণ পেলে তাকে নিজেদের তুলনায় বোকা এবং বিদ্‌কুটে মনে করি! ফরাশী জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত C. Flamman'on তাঁর "The Unknown" পুস্তকে একটা ভারি মজার গল্প বলেছেন, রায় মহাশয়কে সেইটি শোনাতে চাই। গল্পটী খুব বড় বলে, তার সার সংক্ষেপ দিচ্ছি। আসল পুস্তকের ৩—৪পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য। আমি (Famman'on) ফরাশী বিজ্ঞান সভার এক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। Dr. Moncil সেদিন Edisonএর Phonograph পণ্ডিত সভায় প্রথম নিয়ে এসে পরীক্ষা করে দেখান। হঠাৎ আমাদের সভার এক সভ্য জনৈক নামজাদা পণ্ডিত—Dr. Moncilএর কাছে গিয়ে রেগে চোখ লাল করে বেচারী Moncilএর গলা ধরে চীৎকার করে বলে উঠ্‌লো Wretch, we are not to be made dupes by a ventriloquist"। পণ্ডিত প্রবর হচ্ছেন M. Bouilland। ঘটনার তারিখ ১১ই মার্চ্চ ১৮৭৮ সাল। উক্ত পণ্ডিত তারপর ছ-মাস ধরে নিজে যন্ত্রটী পরীক্ষা করে মত প্রকাশ করেন "nothing in the invention but ventriloquism—it was imposible to admit that vile metal could perform work of human phonation!"

হায়রে মানুষ!—"this puny philosopher not six feet high"। বিশ্বের রহস্য সমুদ্রে আমাদের lead-line যে তলা পায় না তা মান্‌বো না—মানবো কি? না অকুল রহস্য সমুদ্রটী আমার এই দড়িরই মাপেরই গভীর!

কিন্তু খোলা-মন উদার-দৃষ্টি বিজ্ঞানজ্ঞানাভিমানীর ঠিক attitude হচ্চে বিশ্বাস করা যে "even floating weeds of novel genera may foreshow a land unknown," এবং জ্যোতির্ব্বিৎ হর্শেলের কথায় এরূপ বৈজ্ঞানিকের উচিত "to believe that all things are not improbable and hope all things not impossible." সার অলিভার এই জাতীয় সত্যসন্ধানকারী বৈজ্ঞানিক!

আচার্য্য Barrett ঠিকই বলেছেন যে, "The splendid and startling discoveries made by Sir W. Crookes in physical science were universally received with respect and belief but his equally careful investigation of psychical phenomena were dismissed by most scientific men as unworthy of serious attention!"

আচার্য্য লজ যখন তাঁর 'Lodge-coherer' বা গঠনতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা বললেন তখন সকলে বিস্ময়ে স্তব্ধ; সেই লজ যখন বলছেন, যে প্রমাণ পাওয়া যাচ্চে মানুষের আত্মা দেহান্তে সজ্ঞানে থেকে কাজ কর্ম্ম করে, খপরাখপর আদান প্রদান করে তখন তাঁর মাথা পুত্রশোকের ধাক্কায় বেকল হয়ে বস্‌লো!

মোট কথা দেখা যাচ্চে যে সাধারণ অজ্ঞ মানুষও যেমন অবিশ্বাস-অতিবিশ্বাসের দাস, শিক্ষিত সংস্কৃতবুদ্ধি পণ্ডিতও তেমনি অবিশ্বাস অতিবিশ্বাসের মোহে কাণ্ডজ্ঞান হারান!

নাস্তিক হিউম বলতেন—"আমি Miracle মানি না, কেন না এ সব ঘটনা মানুষ জাতের পূর্ব্ব-পরিচিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না!" তা যদি বৈজ্ঞানিকের মন্ত্র হয় তা হলে Arago যা বলেছেন তা ঠিক—"where should we be if we set ourselves to deny everything we do not know how to explain?" আমাদের পূর্ব্ব অভিজ্ঞার সঙ্গে তো Radium এর কাণ্ড খাপ খায় না—তবে Radium তত্ত্ব কি মায়া? রজ্জুতে সর্পভ্রম?

এ যুগে জন্মে এই কথাটা আমরা যেন ভুলিনে যে পাগলা হ্যামলেট্ একটা বড় মস্ত সত্য কথা বলেছিল; There are more things in heaven and earth Horatio than are dreamt of in your proud science—আর চিরপোষিত আমাদের মত গুলার মাথায় উদ্ভট্ প্রেতবাদ যে লাঠি মেরেছে তার চেয়ে গুরুতর লাঠি মেরে বসেছেন আপনাদের Einstein!

যাক্। বৃদ্ধ প্রবীণ সত্যবন্ধু জ্ঞানসাধক সার অলিভার সম্বন্ধে রায় মহাশয়ের যে উদ্ভট অবিচারপূর্ণ ধারণা তারই প্রতিবাদ করতে গিয়ে 'অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ' শ্রদ্ধেয় রায় মহাশয়ের যশঃ-ক্ষুণ্ণকর দু একটা কথা বলে থাকি তা সে একটা সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের অঙ্গ মনে করে তিনি যেন আমাকে মাফ্ করেন।

জীবন তরী।

(শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়)

পশ্চিমের ঐ নীল আঙিনায় তারার দীপটী জ্বালি
বিশ্বরাজের পূজার বেদীমূলে
অন্ধকারের ঘোমটা টানি নীরব সন্ধ্যারাণী
নাম্‌ল গলে তারার মালা দুলে।
কি যেন এক মৌন ব্যথায় স্তব্ধ বসুন্ধরা
মনটা শুধু কাঁদছে অকারণে
দিগন্তের ঐ ধূসর তটে ঢেউয়ের মত আজি
চিত্ত আমার লুটায় ক্ষণে ক্ষণে।
তরণী এক মরাল সম শান্ত নদীর বুকে
চলছে কোথা নীরব অন্ধকারে
স্কন্ধে বহি গুণের বোঝা তিনটী মানুষ ধীরে
আগিয়ে চলে জলের ধারে ধারে।
শ্রান্ত ক্ষত চরণ তাদের ক্লান্ত দেহের ভার
বইতে যেন চাহিছে না গো আর
হৃদয় তাদের শান্তি লাগি ব্যাকুল অনিবার
শিশু যেমন চায়রে বক্ষ মার।
থামা তোদের প্রাণের কাঁদন ওরে মাঝির দল
ঐ যে শান্তি ঐ যে আসে পিছে ;
ঐ যে তোদের ফিরিয়ে নিতে দুইটী বাহুর বল
আন্‌ছে তরী কান্না কেন মিছে ?

সকাল বেলায় প্রথম যাঁহার কোমল কঠিন কর
ঠেলে তোদের দিলেন কাজের মাঝে
ভাবিস কি তাঁর তোদের তরে ভাবনা কিছুই নাই
ভুলে তোদের রবেন তিনি সাঁঝে ?
উপলময় এ কঠিন পথের যত দারুণ ব্যথা
যত নিঠুর কাঁটার আঘাত পায়
যত প্রাণের শোণিত দিয়ে আঁকা দুখের কথা
সব যে বুকে বেজেছে তাঁর হায়!
এমনি করে প্রতি উষায় পাঠান তিনি কাজে
আবার সাঁজে বক্ষে তুলে লন
জীবন যখন শ্রান্ত হয়ে ঘুমের লাগি কাঁদে
মরণ রূপে আসে প্রাণের ধন।
তরণী তাঁর এমনি করে চলেছে কোন পূরে
কোথায় কবে পথের হবে শেষ ?
জীবন মরণ এমনি করে নাচছে ঘুরে ঘুরে
হায়রে কোথা সেই অচিনের দেশ।

সিনফিনের জন্মকথা।

(শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।)

১৮৪৮ ও ১৮৬৭ সালের বিদ্রোহ চেষ্টা নিষ্ফল হইবার পর আয়র্লণ্ডে সকলেই একরূপ বুঝিলেন যে বাহুবলে স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করা এখন বিড়ম্বনা মাত্র। এ দিকে পার্লামেণ্টে একশত বৎসর ধরিয়া বিধিসঙ্গত আন্দোলনের ফল দেখিয়া হতাশ হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। দয়া ধর্ম্ম, সুবিচার, ন্যায়সঙ্গত অধিকার--এক কথায় দুর্ব্বল সবলের নিকট যে সমস্ত বুলি আওড়াইয়া কৃপা ভিক্ষা করে--সে গুলি পার্লামেণ্টের কাণে সময়ে অসময়ে ধ্বনিত করিতে আইরিসেরা ছাড়ে নাই। কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।"

আইরিসেরা দেখিল যে জাতীয় পরাধীনতার ফলে তাহাদের পেটের

ভাতও মারা যাইতে বসিয়াছে। ব্রিটিস সামাজ্যের ভার বহনের জন্য ন্যায়তঃ তাহাদের যে কর দেওয়া উচিত, পার্লামেণ্ট তাহাদের নিকট হইতে তাহার অপেক্ষা বাৎসরিক ৭৫০,০০০ পাউণ্ড অধিক আদায় করিয়া লইতেছে। ইংরাজ ব্যবসাদারের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আইরিস ব্যাঙ্ক ও রেলওয়ের কাজকর্ম্ম চালান হইতেছে। আইরিসদের সওদাগরী জাহাজগুলি অনেকদিন হইল মারা পড়িয়াছে। দেশে লোহা, কয়লা প্রভৃতি যা' কিছু খনিজ দ্রব্য ছিল সেগুলা খনির মধ্যেই পড়িয়া আছে। সেগুলা বাহির হইলে পাছে ইংরাজ ব্যবসাদারদের ক্ষতি হয় এই ভয়ে কর্ত্তৃপক্ষেরা সে দিকে ফিরিয়াও চান না। লোকসংখ্যা এত দ্রুতবেগে কমিয়াছে যে ইউরোপে তাহার তুলনা মেলাই ভার। ইংরাজভক্ত "অল্‌ষ্টরেরই" লোকসংখ্যা সত্তর বৎসরের মধ্যে প্রায় আধাআধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সমস্ত দুর্ঘটনা চুপ করিয়া দেখা ছাড়া আর উপায় নাই। কারণ যে কি, তাহা সকলেই জানে ও বুঝে, কিন্তু সেই সর্ব্বনাশা কারণ দূর করিবার সামর্থ্য যে কাহারও নাই!

তা' হোক, কিন্তু মানুষ সহজে হাল ছাড়ে না। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ তাহার আশ। স্বাধীনতা গিয়াছে, শ্রীসম্পদ গিয়াছে—কিন্তু জাতির প্রাণটুকু যতক্ষণ ধুকধুক করে ততক্ষণ সব ফিরিয়া পাইবার আশা যায় না। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা জাতির প্রাণ। আয়র্লণ্ডের সবই গিয়াছিল; কেবল একেবারে যায় নাই গেলিক ভাষা। জাতীয় স্বাধীনতার ক্ষীণ আলো ঐ দীপেই মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। আয়র্লণ্ডের অতীত যুগের গৌরবকাহিনী, আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখের ইতিহাস ঐ ভাষার মধ্যেই নিবদ্ধ। বিদেশী আসিয়া সবই কাড়িয়া লইয়াছিল; কেবল অতীতের গৌরবমণ্ডিত সুখস্মৃতিটুকু বহুদিন পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইতে পারে নাই। কিন্তু "জাতীয় শিক্ষা"র নাম দিয়া যে দিন হইতে ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষায় বিদ্যাদান আরম্ভ হইল, সে দিন হইতে "গেলিক" ভাষার কপাল পুড়িল। আইরিস ইতিহাসের পঠন পাঠন রুদ্ধ হইল; জাতীয়-ভাব-উদ্দীপক কবিতাদি পাঠ্যপুস্তক হইতে বহিষ্কৃত হইল; এবং পিতৃ পুরুষের নাম ভুলিয়া আইরিস বালকেরা আপনাদিগকে "ব্রিটিস" নামে পরিচয় দিয়া গৌরব বোধ করিতে শিখিল। দুই এক পুরুষের মধ্যেই জাতীয় "গেলিক ভাষা" মৃতপ্রায় হইয়া উঠিল।

দেশের যখন এইরূপ অবস্থা তখন "সিনফিনের" উৎপত্তি। বিদেশীকে অস্ত্রবলে দেশ হইতে তাড়াইবারও সামর্থ্য নাই; আর তাহার দ্বারে "ধরনা" দিয়াও লাভ নাই দেখিয়া কয়েক জন আইরিস স্থির করিলেন যে বিদেশীর প্রভুত্ব সর্ব্ব বিষয়ে অস্বীকার করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইয়া দেশের সমস্ত কাজ যথাসম্ভব নিজের হাতে করিতে হইবে। সর্ব্ববিষয়ে এইরূপ স্বদেশী ভাবাপন্ন হওয়ারই নাম, আইরিস ভাষায়—সিনফিন।

আইরিসেরা দেখিলেন যে জাতীয় ভাব বাঁচাইতে গেলে আগে জাতীয় ভাষা সাহিত্য বাঁচাইতে হয়; এবং সেই উদ্দেশ্যেই ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে "গেলিক লিগ" নামক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্যাথলিক হোক, প্রোটেষ্টাণ্ট হোক, সকলেই এই সভার সভ্য হইতে পারিতেন। ধর্ম্ম বা রাজনীতিসংক্রান্ত কোন প্রশ্নই সেখানে উঠিত না। "লিগ" শুধু জাতীয় ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ও প্রচারেই মনোযোগ করিতেন। কিন্তু জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাবও পুনর্জ্জীবিত হইতে লাগিল; জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ফলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজনীতির সহিত গেলিক লিগের কোন সংশ্রব না থাকিলেও উহার প্রভাব ক্রমশঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। একটা জাতি নবজীবনের আস্বাদ পাইয়া যখন জাগিয়া উঠে তখন তাহার কর্ম্ম ক্ষেত্রবিশেষে আবদ্ধ থাকে না।

গেলিক লিগ স্থাপনের পর হইতেই নানাস্থানে "সাহিত্য-সভা" স্থাপিত হইতেছিল; সে গুলি প্রাচীন "ইয়ং আয়ার্লণ্ড" দলের ভাবেই রঞ্জিত। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আর্থার গ্রিফিথ "ইউনাইটেড আইরিসম্যান' নামক সপ্তাহিক সংবাদ পত্র বাহির করিয়া জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে প্রবল স্বদেশী ভাবের স্রোত প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডের জন্য যেরূপ স্বতন্ত্র পার্লামেণ্টের ব্যবস্থা ছিল, গ্রিফিথ তখন তাহারই পক্ষপাতী। কিন্তু আয়ার্লণ্ডের স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী হইলেও তিনি তাহা লাভ করিবার জন্য বিপ্লবসৃষ্টির সমর্থন করিতেন না। তিনি বলিতেনঃ—"আয়ার্লণ্ডের উপর ইংরাজের কোনও অধিকার আমরা স্বীকার করিব না। পার্লামেণ্টে কোনও আইরিস সভ্য পাঠাইব না; কেন না তাহা হইলে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে ইংরাজের আয়ার্লণ্ড সম্বন্ধে আইন গড়িবার অধিকার আছে। তবে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণও আমরা করিব না; অস্ত্রধারণ অন্যায় বলিয়া নহে, সে সামর্থ্য আমাদের আপাততঃ নাই বলিয়া। আমাদের জাতীয় জীবন আমরা আত্মশক্তিবলে গড়িয়া তুলিব। প্রথমে মানসিক স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে; রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল।"

গ্রিফিথ নিজে স্বতন্ত্র পার্লামেণ্টমূলক রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী হইলেও যাঁহারা সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী তাঁহাদের প্রবন্ধাদিও "ইউনাইটেড আইরিসম্যানে" প্রকাশিত ও আলোচিত হইত।

এই সমস্ত শিক্ষার প্রভাবে আয়র্লণ্ডে কতকগুলি নূতন নূতন স্বদেশী দল গড়িয়া উঠিতেছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত Cumann nan Gaedhal (কুমান না গেঢাল) ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। মুখ্যতঃ জাতীয় ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, ব্যায়াম চর্চ্চা ও শিল্প বাণিজ্য বিস্তার, এবং গৌণতঃ আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা লাভে সহায়তা করাই এ সমিতির উদ্দেশ্য। কিন্তু সকলে এ আদর্শ স্বীকার করিল না। তাহারা বলিল—"সাময়িক রাজনীতির সহিত সম্বন্ধ রাখা চাই। দেশের বুকের উপর বসিয়া যাহারা রাজত্ব করিতেছে তাহাদের অস্বীকার করিব বলিলেই তো আর তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। দেশের শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া যখন একদিন না একদিন তাহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতেই হইবে, তখন শুধু জাতীয় সাহিত্য ও শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির দিকে মন দিলে চলিবে না, দেশকে সংঘবদ্ধ করিয়া শক্তিমান করিয়া তুলিবার ব্যবস্থাও থাকা চাই।" এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য Cumann na nGaedhal (কুমান না গেঢাল) সভার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে (১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে) গ্রিফিথ যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তাঁহার আদর্শ ও কার্য্যপ্রণালী সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়া উঠে। সভায় স্থির হয় যে ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে আর যাহাতে আইরিস সভ্য না যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যতদিন পার্লামেণ্টের আইরিস সভ্যেরা স্বদেশের এই অপমানজনক ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া দেশে থাকিয়া দেশরক্ষায় ব্রতী না হন ততদিন যেন বিদেশবাসী আইরিসেরা তাঁহাদের কোনরূপ সাহায্য না করেন।

এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর হইতেই প্রকৃত পক্ষে সিনফিনের জন্ম। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ডবলিন সহরে জাতীয় পরিষদের (National Council) প্রতিষ্ঠা হয়। গ্রিফিথ প্রস্তাব করেন যে ৩০০ সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া আয়র্লণ্ডের এক পার্লামেণ্ট গঠিত হউক। ইংরাজী পার্লামেণ্টের যে সমস্ত আইরিস সভ্য ওয়েষ্টমিনিষ্টারে যাইতে অস্বীকৃত, তাঁহারাও এ নূতন পার্লামেণ্টের সভ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন। দেশের মধ্যে যত মিউনিসিপ্যালিটী বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সভা আছে সেগুলি যাহাতে এই পার্লামেণ্টের আদেশ অনুসারে চলে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আইন ভঙ্গ না করিয়াও যে যে উপায়ে আয়র্লণ্ডকে কার্য্যতঃ ইংরাজের শাসনশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করা যায় জাতীয় পরিষদ তাহারই অনুসন্ধানে করিতে লাগিলেন। স্থির হইল, প্রথমতঃ শিক্ষার ভার নিজেদের হস্তে লইয়া এমন একদল যুবককে গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহারা দেশের কৃষি, শিল্পবাণিজ্য ও শাসন কার্য্য পরিচালন করিতে পারে। কাউন্টী সভার (County council) তত্ত্বাবধানে যত কিছু কর্ম্ম আছে সেই সমস্ত কর্ম্মে প্রতিযোগী পরীক্ষার ফলে এই সমস্ত যুবককে ভর্ত্তি করিয়া দিতে পারিলে ক্রমশঃ ইহাদের দ্বারা একটা "আইরিস সিভিল সার্ব্বিস" গড়িয়া তুলিতে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত দূত রাখিয়া বিদেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। আইরিস ব্যাঙ্ক সমূহ যদি আইরিস শিল্পের উন্নতির জন্য ঋণ না দেয়, তাহা হইলে লোকে যাহাতে ঐ সমস্ত ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আইরিসদিগের তত্ত্বাবধানে নৌ-বাহিনীর সৃষ্টি করিতে হইবে। স্বদেশী শিল্পরক্ষার জন্য আয়র্লণ্ড হইতে ইংরাজী পণ্য বহিষ্কার করিতে হইবে এবং বিচার ভিক্ষার জন্য যাহাতে ইংরাজের দ্বারস্থ না হইতে হয় সে জন্য 'সালিসী' বিচারালয় স্থাপিত করিতে হইবে। এক কথায়, দেশের মধ্যে নিজেদের একটী স্বতন্ত্র শাসনবিভাগ গড়িয়া তুলিয়া হইবে। ইহাই সিনফিনের প্রথম অবস্থার কার্য্য-প্রণালী।

দুই বৎসর কাজকর্ম্ম বেশ উৎসাহের সহিত চলিল; কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই সিনফিনের চীৎকার যেন অরণ্যে রোদন হইয়া দাঁড়াইল। ন্যাসনালিষ্ট (Nationalist) দলের নেতা রেডমণ্ড তখন পার্লামেণ্টের নিকট হইতে হোমরুল আদায় করিয়া লইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সকলেরই দৃষ্টি তাঁহার উপর নিবদ্ধ। সিনফিনের নেতারাও স্থির করিলেন যে এ সময় রেডমণ্ডকে বাধা দিয়া হোমরুল প্রাপ্তির অন্তরায় হওয়া সমীচীন নহে।

১৯১০ হইতে ১৯১৩ পর্য্যন্ত সিনফিন একরূপ নির্জ্জীব হইয়াই পড়িয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য শক্তি ধীরে ধীরে আয়র্লণ্ডে মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। তাহারাই ক্রমে ক্রমে সিনফিনের সহিত মিলিত হইয়া সিনফিনকে পুষ্ট করিয়া তুলিল।

ক্রমশঃ।

বিলাপবিধুরা।

[শ্রীগোবিন্দলাল মৈত্রেয়

কিশোরী কহিছে ললিতায়—
মোদেরি কপাল গুণে গোপাল বিরূপ সখি,
সে দোষে কাহারে দোষা যায়!
আদুরী দাদুরী যবে গাহিবে মিলন গান,
অঝোর নিঝর ঝরে বাদরে বহিবে বান,
সুনীল ফেনিল জলে ভাসায়ে ময়ূর তরী,
কে পার করিবে যমুনায়?

তমাল তলায় যবে বুঝিতে বঁধুর মন,
ছলনা-নয়ন জলে ভাসাব আঁখির কোণ,
আপনা পাসরি সেই দুরজয় অভিমান,
কে বলো ভাঙ্গাবে ধরি পায়?
জটিলা কুটিলা মিলি গোকুল বিকুলি যবে
কালা-কলঙ্কিনী রাধা সবারে ডাকিয়া কবে
বাঁচাতে সরম হতে ফুটা কলসীর স্রোতে—
কে আর রোধিবে বল হায়?

বরজ বিপিনে যবে শিহরি কদম ফুল
মাতাল মধুপ তানে মজাবে কামিনীকুল
শাওন মেঘের তলে অধরে বিজুলী মাখি
কে আর ঝুলাবে রাধিকায়?

ফাগুনে ফাগুয়া লয়ে ব্রজের বালক সনে
গহন কানন ঢুঁড়ি বিনোদিয়া বৃন্দাবনে
বাহুতে বাঁধিয়া প্যারী হাতে লয়ে পিচকারী
কে আর রঙ্গাবে গোপিকায়।

নিপট কপট শঠ ছড়ায়ে যাদুর নিদ
নিঠুর কঠিন করে পাঁজরে কাটিয়া সিঁদ
হরিয়া হরষভরে রাধার নয়ন মনি
শ্যাম যেরে গেল মথুরায়।

সাহিত্যে অনুভূতি।

(অধ্যাপক শ্রীরামপদ মজুমদার এম, এ)

সাহিত্য-সমালোচনার মুস্কিল এই যে সাহিত্যের বেশীর ভাগই অনুভূতির দ্বারা বুঝিতে হয় এবং জ্ঞান ও অনুভূতির পার্থক্য বিভাগ করিয়া দেখা যায় না। চোখের দেখা কতটুকু এবং প্রাণের দেখা কতটুকু ইহার কেহ স্থির নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। ভালবাসিলে যে কতখানি পাওয়া যায়, যে ভালবাসে নাই তাহাকে তাহা কেমন করিয়া বুঝান যাইবে? এই জন্য ইংরাজ-কবি সেলি প্রেমকেই সাহিত্যের ভিত্তি বলিয়া গিয়াছেন। সত্যোপলব্ধি বা সত্যের জ্ঞান এক কথা; সত্যানুভূতি, ভাবের দ্বারা সত্যগ্রহণ আর এক কথা। সত্যোপলব্ধি যেন জানার জন্যই জানা, অথবা প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য জানা, চিকিৎসকের যেমন রোগীকে জানিতে হয় অথবা বৈজ্ঞানিক যেমন তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন। সত্যানুভূতি যেন প্রেমের দৃষ্টিতে জানা, ইহা তেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে চায় না, অথচ এ জানা কত বেশী, ইহা কত আপনার করিয়া লয়—ইহাতে এমন আত্মবিহ্বলতা আছে যে ইহা পাইতে চায় যতটুকু দিতে চায় তার ঢের বেশী,—নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়াও ইহার আত্মতৃপ্তি হয় না। সেই জন্য অনুভূতি দিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাতে মানবের এত আনন্দ। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এত চর্চ্চা সত্ত্বেও আমরা শিল্প ও সাহিত্য ছাড়িতে পারি না। চণ্ডীদাস যখন আবেগের উচ্ছ্বাসে জাতিকুলমান জলাঞ্জলি দিয়া, সামাজিক সংস্কার বিলুপ্ত করিয়া রজকিনী রামীকে 'বেদবাদিনী' বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলেন—তখন তাহা কোনও নারী বিশেষে প্রযোজ্য হয় নাই। সেই মুহূর্ত্তে প্রেমের যে স্বরূপ তাঁহার চিত্তে জাগরূক হইয়াছিল

এবং নারী-হৃদয়ের সমস্ত সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া অখণ্ড মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল তাহারই সাম্‌নে তিনি যে গভীর প্রণতি অনুভব করিলেন,—যেন সেই গৌরবের চরণে ধূলির সাথে ধূলি হইয়া যাইতে চাহিলেন ;—তখনকার তাহার মনের সেই ভাবটীকে আকুল হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনাব মধ্যে আর ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না, কামনার পরপারে ভোগবিরতির মধ্যে তাহাকে লয় করিয়া ধর্ম্ম ও প্রেমের সাম্য-স্থাপন করিয়া দিলেন। ভাবের যে গভীরতা এখানে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহাকে ইঙ্গিতে প্রকাশ করা চলে, ভাষায় সম্যক্ স্ফুট করা যায় না, কারণ, ইহা জ্ঞানের সীমা ছাড়িয়া অনুভূতিতে মিশিয়া গিয়াছে। বাস্তবিক এই তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদিগকে প্রকাশ করিবার জন্য যে চণ্ডীদাস ঐ কথাটী ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা নহে। খুব সম্ভবতঃ ঐ কথাটী ব্যবহার করিবার পরেও তাঁহার মনে এ সব তত্ত্ব উদিত হয় নাই। তাঁহার অধ্যাত্ম সত্তায় এই তত্ত্বগুলি অস্ফুট অবস্থায় নিহিত ছিল এবং প্রেমানুভূতির গভীরতা ভাবের সহজ ধর্ম্ম অনুসারে এগুলিকে ঐ একটী কথার মধ্যে স্ফুট করিয়া দিয়াছিল।

ঠিক এই একই প্রকারে শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্ট হইয়া থাকে। সাহিত্যিক ভাবের দ্বারা অর্থাৎ অনুভব করিয়া সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করেন। জ্ঞানের দ্বারা সত্যোপলব্ধি দর্শন বা বিজ্ঞান, এবং যখন ইহা ভাবের সাহায্যে হয়, তখন তাহা অনুভূতি। কোনও বিশেষ তত্ত্ব অথবা সত্য উপলব্ধি করিয়া কল্পনার দ্বারা সাহিত্যিক তাহাকে অলঙ্কৃত করেন না এবং তাহা করিলে শিল্প হিসাবে এ সাহিত্য শ্রেষ্ঠ বলা যায় না। কখনও কখনও যেমন দেখা যায় যে অনেকের সঙ্গীতবিদ্যা না জানা থাকিলেও তাঁহারা সুন্দর সঙ্গীত আলাপন করিতে পারেন,—ইহা তাঁহাদের স্বভাবধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়—সাহিত্যিকেরও তেমনই একটী ধর্ম্ম আছে যাহাতে তাঁহারা স্বভাবতঃই প্রত্যেক সত্তা ভাবের দ্বারা অনুভব করিতে পারেন, অধ্যাত্মচেতনার গভীরতা স্বভাব-নিয়মে সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলেন। মিল্টন তাঁহার মহাকাব্যে যে সত্যের প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছিলেন,—মানুষের নিকট ভগবানের বিভূতি প্রকাশ করিয়া জগতের ভিত্তি মঙ্গলের উপর প্রতিষ্ঠা করিতে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন—সে হিসাবে ধরিলে তাহার কাব্য বহুল পরিমাণে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি যাহা প্রতিপাদন করিতে চাহেন নাই, সম্পূর্ণতা,—সার্থকতার প্রতি যে উন্মুক্ত আবেগ তাঁহার অধ্যাত্মচেতনার গভীরতা হইতে উৎসারিত হইয়া শব্দতান,

আদম ও হবার চরিত্রে এবং সহস্র সৌন্দর্য্য বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছে—তাহারাই আজ তাঁহার কাব্যকে বিশিষ্টতা প্রদান করিতেছে। সাহিত্যিকের যে জ্ঞান নাই তাহা নহে কিন্তু সে জ্ঞান তিনি তাঁহার সমগ্র সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারেন না। মাতা যেমন সন্তানকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভক্তি করে—এই ভালবাসা ও ভক্তির মধ্য দিয়াই যেন তাহাদের সমস্ত জীবন সার্থকতা লাভ করিতে চায়—সাহিত্যিকও তেমনই তাঁহার সমস্ত প্রাণ দিয়া অধ্যাত্মচেতনার সম্পূর্ণতা লইয়া কোনও বিশেষ জিনিষের অথবা সত্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন। এইরূপ ভাবে সম্বন্ধ-স্থাপনের নামই অনুভূতি। অনুভূতি বলিলে যে কি বুঝি, ইহার সংজ্ঞা কি - তাহার দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া না যাইতে পারে, এবং সাহিত্য-সমালোচনা হিসাবে বোধ হয় তাহার প্রয়োজনও নাই ; তবে এইমাত্র বলা যায় যে ইহা জ্ঞানও নহে, কল্পনাও নহে—এমন কি ভাবময় কল্পনাও ইহা নহে—ইহা জ্ঞান, ভাব ও কল্পনার সেই সুষুপ্তি অথবা সাম্যাবস্থা*—যখন ইহাদিগকে পৃথক করিয়া দেখা যায় না,—জ্ঞানের সহিত ভাবের, ভাবের সহিত কল্পনার ব্যবধান লুপ্ত হইয়া মন একটী অনির্ব্বচনীয়তায় পূর্ণ হয় এবং জিনিষের স্বরূপ আমাদের নিকট পরিস্ফুট করিয়া তুলে। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে অনুভূতিতে আমাদের সমস্ত অধ্যাত্মসত্তা জাগ্রত হইয়া মনের পরস্পরবিরোধী ভাবগুলির একটী সমন্বয় করিয়া দেয় এবং চৈতন্যের মুক্ত স্রোতে অবগাহন করিয়া প্রেমের আলোতে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায়। অনুভূতি থাকিলেই, সহানুভূতি থাকে, এবং জিনিষের সঙ্গে অথবা সত্যের সঙ্গে সমপ্রাণতা অনুভব করিয়া তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা জন্মে। এইজন্য প্রচলিত ধারণায় সহানুভূতিমূলক কল্পনাকে সাহিত্য-সৃষ্টিতে এত উচ্চ আসন দেওয়া হইয়া থাকে,—কিন্তু বাস্তবিক ইহা কেবল কল্পনা নহে,অনুভূতিমূলক কল্পনা যাহা বুঝিতে হইলে মানুষের সমগ্র অধ্যাত্মসত্তা বুঝা দরকার! জ্ঞানে নহে, বিজ্ঞানে নহে, সাহিত্যের মধ্য দিয়াই সমগ্র মানুষকে পাওয়া যায়। মানুষের যাহা সাহিত্যে ধরা পড়ে না, ভাব-জগতের চিরসম্পদ হইয়া যায় না তাহাতে হাজার বাহ্যাড়ম্বর থাকুক্ না কেন,—সভ্যতার ফেনিল উচ্ছ্বাসে তাহা পরিপূর্ণ হউক

* Wordsworth মনের এই ভাবটীকে 'wise passiveness' বলিয়াছেন। এই ভাবটীর একটী অতি সুন্দর বর্ণনা তাঁহার Tintern Abbey সম্বন্ধীয় কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায়।

না কেন—কালের স্রোতে আপনিই মিশিয়া যাইবে,—তাহা ক্ষণস্থায়ী,—চঞ্চল। কিন্তু যাহা একবার অনুভূতির মধ্য দিয়া সৌন্দর্য্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে,তাহার ভিত্তি এমন একটা চিরন্তন সত্যের উপর—যে ইহা অপ্রত্যক্ষকেও প্রত্যক্ষের চেয়ে মূল্যবান্ করিয়া দেয়। ইহাকে শুধু কল্পনার খেলা বলা উচিৎ নহে, কারণ ইহা জ্ঞানের চেয়েও গভীর। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যখন তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে এক অনির্ব্বচনীয় সুষমা ও শান্তি সমস্ত প্রাকৃতিক জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া দেখিয়াছেন,—তখন তাহাকে কি বলিব, তখন তাহা কি শুধু জ্ঞানের, না ভাবের, না কল্পনার? ইহা যে কেবল জ্ঞানের নহে,—সে কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে; কারণ জ্ঞান দিয়া ধরিলে এ সুষমাও শান্তি সর্ব্বত্র দেখা যায় না, অথচ ভাব ও কল্পনা যে ইহাকে জন্ম দিয়াছে,—একথাও বলিতে পারি না কারণ আমাদের মনের সহজ প্রত্যয় বলিয়া দিতেছে যে এ সুষমা ও শান্তি যেন বাহ্য-প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে জড়ান আছে। এই অনুভূতি আমাদের নিকট এতই সত্য, এমন প্রত্যক্ষ যে আমাদের সমস্ত জ্ঞান একত্র হইয়াও ইহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারে না।

শিল্পী যেমন অনুভূতি দিয়া সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করেন, সমালোচকও তেমনই অনুভূতির সাহায্য ছাড়া শিল্পসৃষ্টির গূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না। ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁর মতে সৃষ্টি ব্যাপারটাই এমন যে ইহা জ্ঞানে ধরা দিতে চায় না, কারণ সৃষ্টির মধ্যে যে অখণ্ড গতি বর্ত্তমান, জ্ঞানের নিকট তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া প্রাণশক্তি হারাইয়া জড়ভাবাপন্ন গুণের সমষ্টি হইয়া যায়। সাহিত্যিকের রচনাগুলির প্রকৃত বিচার করিতে হইলে ইহাদিগকে সৃষ্টি হিসাবে দেখিতে হইবে, তত্ত্ব হিসাবে দেখিলে সব সময়ে বুঝা যাইবে না। সাহিত্য-রচনার ভিতর,—প্রত্যেক শিল্প সৃষ্টিতে -এমন অনেক জিনিষ প্রচ্ছন্ন থাকে যাহা পরে জ্ঞান ও সমালোচনার সাহায্যে তত্ত্বের আকার ধারণ করিতে পারে এবং এইরূপে সাহিত্যও পরোক্ষে জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করে। বাস্তবিক একদিক দিয়া দেখিতে গেলে আগে অনুভূতি, পরে জ্ঞান; আগে সাহিত্য, পরে দর্শন। ঋষিরা অনুভূতি দিয়া যাহা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পাই বেদে—সেই অনুভূতির উপর যুক্তি ও তর্ক খাটাইয়া যে শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছিল তাহা পাই বেদান্তে। বেদই যদিও বেদান্তের ভিত্তি, তবুও ইহা পাঠ করিলে বৈদিক সাহিত্য ঠিক বুঝা হয় না। সেইরূপ কোরাণ সরিফ হইতে কত দর্শন আসিয়াছে—কিন্তু কোরাণের প্রকৃত

তাৎপর্য্য কোরাণেই আছে। এগুলিকে সাহিত্য-হিসাবে বিচার করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে ভাব-নিঃসৃত যাহা, তাহাকে জ্ঞানে পরিণত করিলেই তাহার স্বরূপ বদ্‌লাইয়া যায়। ধর্ম্মের উৎপত্তি অনুভূতিতে, তাহার পরিণতি দর্শনে। এবং ধর্ম্ম যে চিরকাল ধরিয়া মানুষের মনের উপর এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার একটি কারণ এই যে, ধর্ম্ম সাহিত্যের সহিত, সৌন্দর্য্যের সহিত এমন ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট—ভাবের সহিত এতই বিজড়িত। ধর্ম্মকে তত্ত্ব বিবেচনা করিলে,—ধর্ম্ম ধর্ম্মই থাকেনা—দর্শন ও নীতিশাস্ত্র হইয়া যায়। সাহিত্যে ধর্ম্মের যে আভাস আমরা পাই তাহা অনুভূতি-লব্ধ—তত্ত্বালোচনা নহে। তত্ত্বালোচনা যুক্তির, কার্য্যকারণ পরম্পরার অপেক্ষা রাখে, সাহিত্য ভাবের সরলতা ও গভীরতা দিয়া বিচার করে, - তাহাকেই যেন আপ্তবাক্য বলিয়া মানে। সে মনে করে যে যাহার মহত্ত্ব ও বিশালতা তাহাকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে যাহার সৌন্দর্য্য ও কান্তি তাহাকে উচাটন করিতেছে, যাহার প্রেম ও মঙ্গলমূর্ত্তি তাহাকে বশীভূত করিয়াছে—তাহার আবার যুক্তি কি,—তাহার হৃদয়ই যে তাহাকে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। সেই জন্য সাহিত্য হৃদয়ের ভাষায় আমাদের নিকট ধর্ম্মের কথা বলে,—জ্ঞানের ব্যাকরণ হয়ত তাহাতে অনেক অশুদ্ধি বাহির করিতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে তাহাকে সাহিত্যের ভাষাতেই বুঝিতে হয়,জ্ঞান দিয়া তাহার কিছু কিছু সংশোধন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের যেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবেই ধর্ম্ম-কবিতা, তাহাতে তত্ত্বের কথা বড় একটা নাই' কিন্তু ধর্ম্মের অনুভূতি আছে। তত্ত্ব ও নীতি শুষ্কতর্ক, ধর্ম্ম ও সাহিত্য সরস আনন্দ। তত্ত্ব ও নীতির পথে চলিতে হইলে সংসারের কণ্টকাকীর্ণ পথে, প্রতিপদে আত্মসংযম ও আত্ম-চিন্তা দ্বারা নিজেকে চালিত করিতে হইবে, প্রত্যেক কর্ম্ম জ্ঞানের মানদণ্ডে তুলিয়া মাপিতে হইবে; সেই জন্য নীতির পথ এত জটিল,—এত সন্দেহাত্মক, - ইহাতে আনন্দ নাই, মুক্তি নাই কিন্তু সাহিত্য যে আনন্দের মধ্য দিয়া ধর্ম্ম-ভাব উন্মেষিত করে—তাহাতে আমাদের আত্মা মুক্ত হইয়া যায়,—অন্তরের অপরিজ্ঞাত রহস্যের সহিত এক হইয়া, প্রাণের অবারিত গতি অনুভব করে। যে প্রেম ও প্রণতি, যে বিস্ময়-জড়িত আনন্দ জাগাইয়া তুলে, তাহাতে হৃদয় আপনিই নমিয়া পড়ে।

মনে করুন সেই দিন যেদিন কবি শান্ত উষার নির্ম্মল বাতাসে জাহ্নবী-তীরে তাঁহার প্রেয়সীকে স্নান-অবসানে শুভ্রবসনে পুষ্পরাজি তুলিতে দেখিয়াছিলেন,

তখন দূরে দেবালয়-তলে উষার রাগিনী বাঁশিতে বাজিয়া উঠিতেছিল ;—তাঁহার সীথিমূলে যে অরুণ সিঁদুর রেখা এবং তাঁহার বাম বাহু বেড়িয়া যে শঙ্খবলয় তরুণ ইন্দুলেখার মত শোভা পাইতেছিল, তাহারা যে মঙ্গলময়ী মুরতি যে দেবীর বেশ বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে কবির হৃদয় সহসা সম্ভ্রমে ভরিয়া অবনতশির হইয়া পড়িয়াছিল ;—সেই দিনকার সেই ক্ষণিকের দর্শনে সমস্ত হিন্দু জাতির যে সুপ্ত ধর্ম্ম-চেতনা তিনি জাগাইয়া দিয়াছেন তাহা ত শুধু চোখের দেখা নহে,—ইহাকে অনুভূতি দিয়া প্রাণের সহিত প্রাণ মিলাইয়া দেখিয়া লইতে হয়, এবং সেই জন্যই ইহা নিত্যকালের সামগ্রী, চির পুরাতন হইয়া গিয়াছে। আর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শিক্ষার বিচিত্রতায় হিন্দুর পর্ণকুটীরের এই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতি একবারও ফিরিয়া তাকাইলেন না ; জ্ঞানের অভিমানে বিমুগ্ধ হইয়া হিন্দু-সভ্যতার সেই দয়াময়ী ধর্ম্মস্বরূপিণী কল্যাণীকে আমাদের লাঞ্ছিত জীবনের স্তিমিত আলোকে ফেলিয়া রাখিয়া, প্রেমিকাকেই সখীবেশে সাহিত্য-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন! তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব দিয়াছেন; জ্ঞানের দিক হইতে ধার্ম্মিকের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন কিন্তু শিল্পীর একপ্রাণতা লইয়া ধর্ম্মের এমন সহজ অনুভূতিলাভ করেন নাই যাহার সাম্‌নে আমাদের মস্তক স্বতঃই অবনত হইয়া পড়ে। জ্ঞানের কথা যিনি বলেন তিনি ধন্য, আরও ধন্য তিনি যিনি জ্ঞানকে অনুভূতিতে লয় করিয়া দেন!

অনন্তের যে অনুভূতি কবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের, "নীল আকাশে অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো", এই গানটীতে মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে তাহার গভীরতা এতই বেশী যে ধর্ম্মতত্ত্বে ইহাকে ধরা যায় না,—ইহা যেন অন্তর-ধর্ম্মের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়াছে,—এবং ঝুড়ি ঝুড়ি আধ্যাত্মিক কবিতার অনুনাসিক "হা হুতাশ" ধ্বনি ইহার বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহে। বাস্তবিক অনুভূতির তাৎপর্য্যই এই যে ইহার মধ্যে প্রাণের সরল আবেগ আছে, ইহা লাভ করিতে হইলে চাই ঋষির অন্তর্দৃষ্টির সহিত বালকের শুভ্র সরল প্রাণ। এইরূপ কবিতা পাঠে বুঝিতে পারি ধর্ম্মের সংস্কারের সহিত ধর্ম্মের অনুভূতির কি পার্থক্য! বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় সাধারণ ধর্ম্ম-সঙ্গীতে ধর্ম্মের অনুভূতি বড় একটা পাওয়া যায় না; ইহারা যেন ধর্ম্মের বৈঠকী গান ;—সুসজ্জিত প্রার্থনা-মন্দিরের বৈদ্যুতিক আলোকে গীত হইলে, এগুলি শুনিতে মন্দ লাগে না ; কিন্তু প্রকৃতির উন্মুক্ত আকাশ-তলে যেখানে শত শত চন্দ্র তারকা ঝালরের মত ঝুলিতেছে, সেখানে ইহাদের প্রতি পদই যেন মানব-মনের সনাতন

ধর্ম্মকে প্রতিহত করিতে থাকে। রাম প্রসাদের সঙ্গীতের স্বচ্ছ স্রোতে সংসারের অনিত্যতা তুচ্ছ করিয়া, সামাজিক সংস্কারকে আচ্ছন্ন করিয়া ধর্ম্মের যে অনুভূতি সহজ আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছে আজিকালিকার ধর্ম্ম-সঙ্গীতে তাহা দেখিতে পাই না, কারণ এ গুলির রচয়িতাদিগের নিকট ধর্ম্ম অনুভূতির বিষয় না হইয়া জ্ঞানের অথবা সংস্কারের বিষয় হইয়া গিয়াছে ; এবং জ্ঞানের প্রকৃতিই এই যে ইহার কতখানি নিজের এবং কতখানি পরের তাহা ঠিক করা যায় না, বাঁধিগতের মত ইহাকে আওড়ান' চলে,—আর অনুভূতি যাহা তাহাকে অনুভব করিয়া পাইতে হয়,—এবং সেই জন্যই বোধ হয় জ্ঞানকে ভাবের মধ্যে 'খাপ্‌ খাওয়ান' এত কঠিন।

বর্ত্তমান সময়ের বাদ্য-যন্ত্রের বাঁধি সুরের সহিত পূর্ব্বেকার বাদ্য-যন্ত্রের যে প্রভেদ, জ্ঞানের সহিত অনুভূতির তেমনই প্রভেদ। অনুভূতি বিশেষভাবে ব্যক্তিগত হইয়াও ব্যক্তিত্বের বাহিরে, জ্ঞান সার্ব্বভৌমিক হইয়াও ব্যক্তিত্বের ভিতরে। জ্ঞানের সুর যেন সকলের জন্য বাঁধা হইয়া গিয়াছে ;—তাহাতে ব্যক্তিত্বের কোনও প্রকাশ নাই ;—মর্ত্ত্য-হৃদয়ের বিচিত্র লীলা, ঘাত-প্রতিঘাত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বর্গের অমল কান্তি ধারণ করিয়াছে। অনুভূতির ঝঙ্কারে ভাবের ঐক্য থাকিলেও ইহা ব্যক্তি-বিশেষের নিকট বিভিন্ন রকমে ধ্বনিত হইয়া উঠে। সত্যকে যখনই অনুভব করি, তখনই তাহার স্বরূপ বদ্‌লাইয়া যায়,—তাহা জ্ঞানের রাজ্য ছাড়িয়া বিশেষভাবে ব্যক্তিগত হইয়া পড়ে,—ভাব-বস্তুতে পরিণত হয়—আনন্দের স্পন্দনে শিল্পীর সত্তা তাহার সহিত মিশিয়া গিয়া এক অনাস্বাদিত রসের পরিচয় করাইয়া দেয়। সত্যানুভূতির ভিতর এই অনির্ব্বচনীয়তা আছে। এই জন্য আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে সাহিত্যকে রসের দিক হইতে বিচার করা হইয়াছে, কারণ মানব-মনের সহিত সত্যের সংযোগে যে বিভিন্ন ভাবের সঞ্চার হয়, তাহাকেই রস বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য সমালোচকেরা তাহা করেন না কারণ তাঁহারা মনে করেন যে ভাবের কোনও যুক্তি-সঙ্গত শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে না, ভাবের বিশ্লেষণ চলে না। প্রত্যেক ভাবের মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব আছে যাহা এক হইতে অন্যকে মূলতঃই পৃথক করিয়া দেয়। ভাব অনুভব করিবার, বিচার করিবার নহে। সে যাহাই হউক আমি আমার প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে "অনুভূতি" বলিলে যাহা বুঝি তাহা শুধু ভাব-বস্তু নহে—ভাবের গভীরতা দিয়া সত্যের একটী পূর্ণতর স্বরূপ লাভ করিবার প্রয়াস হইতে

ইহা সম্ভূত। মানুষ জ্ঞান দিয়া সৃষ্টির যে রহস্যের মধ্যে ঢুকিতে পারে নাই, যেন ভাবের গভীরতা দিয়া,—সমস্ত অধ্যাত্মসত্তাকে একই বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইবার চেষ্টা করে। সাহিত্যের নিম্ন স্তরে, রস- যেখানে ভাবের জন্যই ভাব, অর্থাৎ ভাবকেই মুখ্য জ্ঞান করিয়া সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া তাহার বিভিন্ন প্রকাশই সাহিত্যের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। সাহিত্যের উচ্চস্তরে প্রজ্ঞা,—যেখানে ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াও সাহিত্য সমস্ত ভাবকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে,—এমন একটী অবস্থায় পৌঁছিতে চায় যেখানে অন্তরের দিব্যদৃষ্টি জীবনের গূঢ়তম প্রদেশকে আলোকিত করিতে পারে। ইহার নিম্নে জ্ঞান ও কল্পনা,—উচ্চে, সমস্ত জ্ঞান ও কল্পনা বিরোধ করিয়া একটা নির্ব্বিকল্প ভাব আত্মার গভীর অনুভূতি।

সেইজন্য সাহিত্য যতই উচ্চে উঠিতে থাকে ততই যেন ধর্ম্মের সহিত ইহার ব্যবধান লুপ্ত হইয়া যায়;—সাহিত্যের পরিণতি ধর্ম্মে। কিন্তু সাহিত্যের ধর্ম্ম অনেক সময়েই লৌকিক ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কারণ ইহা অন্তরের অন্তরতম ধর্ম্মকেই ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে। যে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কারের স্তর ধর্ম্মের উপর জমিয়া আমাদের প্রাণের গতি আড়ষ্ট করিয়া রাখে, তাহাদিগকে সরাইয়া অন্তর্জীবনের প্রস্রবন মুক্ত করিয়া দেয়। সাহিত্যিক সাক্ষাৎভাবে ধর্ম্মের কথা না বলিলেও ধর্ম্মই সাহিত্যের প্রাণ। যাহার অন্তর্দৃষ্টি, অনুভূতির গভীরতা যত জিনিষের সত্তার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, প্রাণের স্বরূপ—জীবনের গতি—তাঁহার নিকট তত ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে;—ততই তাঁহার রচনার আভাসে ও ইঙ্গিতে যেন কোনও অপরিজ্ঞাত রহস্য নিজেকে মূর্ত্ত করিতে চায়,—মানবের ভাষা তথায় পৌঁছিয়াও পৌঁছিতে পারে না:—জীবনের ক্ষুব্ধতা ও কর্ম্মের কোলাহল শান্ত করিয়া রাত্রির মৌন-গম্ভীর স্তব্ধতা লোকলোকান্তরে প্রসারিত হইয়া পড়ে।*

সাহিত্যের এই বিস্ময়-বিজড়িত রহস্যের ভাব কেবল ধর্ম্মগ্রন্থে নহে—সর্ব্বত্রই কমবেশী পরিমাণে দেখা যায়; এবং দুঃখ, শোক ও বিয়োগের মধ্যেও

* "This unique expression (Poetry) still seems to be trying to express something beyond itself." About the best poetry and not only the best, there floats an atmosphere of infinite suggestion. * * * * His (the poet's) meaning seems to beckon away beyond itself or rather to expand into something boundless which is only focussed in it; something also, "which, we feel, would satisfy not only the imagination but the whole of us." Bradley's Oxford Lecturtes.

হৃদয়ে শান্তি ধারা বর্ষণ করে। এই রহস্যকে স্ফুট করিয়া দেখিতে চাহিলে,—নিজেকে এত ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয় যে জীবনের ব্যর্থতার চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া উপহাসের অট্টহাসি শুনিতে পাওয়া যায়। একদিকে যেমন কর্ডেলিয়ার মৃত্যু-শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া অসীম রহস্যাবৃত এই মানবজীবন আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়,—সকল দুঃখ, সকল দ্বন্দ্ব তিরোহিত করিয়া যেন একটা পূর্ণতার আভাস ফুটিয়া উঠে; আর একদিকে তেমনই এই রহস্যের বিশালতা আমাদিগকে এতই অভিভূত করিয়া ফেলে, যে আমাদের সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত অহঙ্কার একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। এই রহস্য ধর্ম্মে যেমন স্ফুট হইতে পারে, সাহিত্যে তেমন পারে না; কারণ এইরূপ করিলে যে সৌন্দর্য্যোপলব্ধি সাহিত্যের ভিত্তি তাহা অনেকটা ম্রিয়মান হইয়া পড়ে। সৌন্দর্য্যের প্রকৃতিই এই যে সে অতীন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে চায়, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষের মধ্যে ধরিয়া দেয়,—এক হিসাবে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতেই তাহার আনন্দ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে বাদ দিয়া সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি হয় না। কিন্তু এই রহস্যের মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে ধরিলে তাহা যেন ছায়াতে মিলিয়া যায়, তাহার আর কোনও সত্তাই থাকে না। সাহিত্যে যে "রূপ হইতে ভাবে, ভাব হইতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা" দেখিতে পাওয়া যায় ইহাকে সম্ভবপর করিতে হইলে, এই রহস্যের ভাবটীকে একটু প্রচ্ছন্ন রাখিতে হয়। ধর্ম্ম-সাহিত্য অনেক সময়েই এই রহস্যের ভাবে অতিমাত্র পরিপূর্ণ এবং সেই জন্য তাহা শিল্প হিসাবে উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। অন্য সাহিত্যও যখন ইহাতে ভরপুর হইয়া উঠে, তখন আর তাহাতে শিল্পসৃষ্টির গূঢ় মর্ম্ম সম্যক্ প্রকাশিত হয় না। কেবল অনুভূতিই সাহিত্য নহে,—যদি সেই অনুভূতিকে সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত করিতে পারা না যায়। কিন্তু তাহা হইলেও এ কথা সত্য যে এই রহস্যের আভাস না থাকিলে সাহিত্য আমাদিগকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না। কারণ কেবল জড়প্রকৃতির মধ্যে বিচরণ করিয়া; সসীমের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া মানুষ কখনই সার্থক-বোধ করে না! সে তাহার সমস্ত সম্পর্কের ভিতর দিয়া, তাহার সমস্ত জ্ঞান ও সৌন্দর্য্য বোধ ছাড়াইয়া অসীমের একটা ক্ষীণ স্পন্দন অনুভব করিতে চায়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও সেলি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে গিয়া অক্ষয় সৌন্দর্য্যের দ্বারে উপনীত হ'ন; সেক্ষপিয়র মানব-চরিত্রের মর্ম্ম বুঝিতে গিয়া জীবনের গূঢ়তম ধর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়া বসেন; বৈষ্ণব কবিতার মোহমুগ্ধ মানবীয় প্রেম অনন্ত

প্রেম-স্বরূপে মিশিয়া যায়; আর রবীন্দ্র নাথ তাঁহার আবেগবিহ্বল হৃদয়ের চঞ্চলতা লইয়া কখন যে সেই অসীমের কূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন;—সেই মায়ামৃগ ক্ষণেকের জন্য কখন যে তাঁহার লুব্ধ নয়ন প্রান্তে দেখা দিয়াছিল,—শুক্ল সন্ধ্যার সৌম্য সৌন্দর্য্যে অশ্রুবিগলিত হইয়া পড়িয়াছিল—তাহা নিজেই বুঝিতে পারেন নাই; এবং যেদিন হইতে বুঝিতে পারিয়া তাহাকে কাব্যে ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন সেই দিন হইতেই যেন জ্ঞানের আলোকে আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

বাঙ্গলায় 'অনুভূতি' কথাটার বিশেষ সুবিধা এই যে ইহা একদিকে যেমন কোনও কিছু অনুভব করা বুঝায় আর একদিকে তেমনই কোনও কিছু অনুভব করিয়া তাহার অন্তরের স্বরূপটী উপলব্ধি করিবার প্রয়াসকেও 'অনুভূতি' বলা যাইতে পারে। ইংরাজীতে এমন কোনও শব্দ নাই যাহা ইহার মত শিল্প ও সাহিত্য-সমালোচনার একটী দিক্ এমন সম্পূর্ণভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারে। শুধু উপলব্ধি অনুভূতি নহে কিন্তু যখন উপলব্ধির দ্বারা ভাবের উদ্রেক হয় তখনই তাহা অনুভূতি; এবং ভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনে যে একটী সহজ প্রত্যয় জন্মে,—যাহার দরুণ সত্যের সহিত আমাদের ব্যবধান লুপ্ত হইয়া সত্যকে পূর্ণতর বলিয়া বোধ হয়,—ভাব-প্রণোদিত সেই প্রত্যয়কেও 'অনুভূতি' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে; কারণ ইহাও অনুভব করিবার বিষয়, জ্ঞান দিয়া ইহাকে প্রতিপন্ন করা যায় না। বাস্তবিক যে জ্ঞান আমাদের অনুভূতির মধ্যে আইসে নাই, যাহার ভিতরে আমরা 'রস' পাই না, তাহার সহিত আমাদের প্রাণের কোনও সম্পর্ক স্থাপিত হয় না;—বিচার-বুদ্ধির প্রখরতা, কর্ম্মজীবনের জটিলতা তাহাতে বাড়িতে পারে, কিন্তু তাহা প্রাণের গতির সহিত যুক্ত হইয়া আমাদিগকে প্রসারিত মুক্ত করিয়া দিতে পারে না। সাহিত্যের বিশেষত্ব এই যে সে জড় জগতের ও যুক্তি-বুদ্ধির প্রাধান্য খর্ব্ব করিয়া, জীবনে সত্যানুভূতি বাড়াইয়া জ্ঞানের সহিত ভাবের, সত্যের সহিত সৌন্দর্য্যের বিরোধ ঘুচাইতে চেষ্টা করে; এমন কি বহিঃপ্রকৃতিকেও অন্তরের লাবণ্যে মণ্ডিত করিয়া মর্ত্ত্যভূমির দ্বারা মানব-জীবন সমগ্রভাবে দেখিয়া অনন্ত-প্রসারিত রহস্যের মধ্যে তাহাকে নিমগ্ন করিয়া দেয়।

প্রভাতে

অসীম হ'তে উথ্‌লে উঠে
আনন্দেরি ধারা,
আসীম তারি সুখের স্রোতে
হ'ল আপন-হারা;
স্বপন মাঝে সুপ্ত ছিল
মোহের উরসে,
অরুণ রাগে আশীস্ জাগে
মলয় পরশে।
ভ্রমর ফুলে মিলন আশে
বেড়ায় গুঞ্জরি,
গন্ধে গানে জাগায় প্রাণে
আশার মঞ্জরী;
গহন বন মোহন হ'ল
যাহার আলোকে
নিখিল বিশ্ব তাহার শিষ্য
প্রাণের পুলকে।

সুখের ঘর গড়া

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত)

যজ্ঞেশ্বরী দেবী স্নান-আহ্নিক সারিয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন। ইতিপূর্ব্বেই নলিনী চাতালের উপর আসিয়া বৃদ্ধা মুসলমানির প্রতি কৌতূহল পূর্ণ প্রশ্ন আরম্ভ করিয়াছিল। বৃদ্ধা তৃষ্ণায় ও পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হইয়াছিল, তার উপর কি একটা অসহ্য গুপ্ত বেদনায় তার মুখমণ্ডল অত্যন্ত করুণ দেখাইতেছিল। বুড়ী

যা' পারিতেছিল দু' একটার উত্তর দিতেছিল। কিরণ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে নলিনীই তার উত্তর দিয়া বলিল "চেননি দিদি একে? এ এস্‌মাইলের মা, ও তার বউ—আমাদের ছাত থেকে খালপারে যে তালপুকুর দেখতে পাওয়া যায় ঐখানে ওদের বাড়ী পুবদিকের ঘরটা এদের; কে সেটা পুড়িয়ে দিয়েছে! বুড়ীর বউ জল আনিলে, বুড়ী পরম আগ্রহে ঢক্ ঢক্ করিয়া প্রায় বদনার অধিকাংশ জলটুকু তপ্ত বালির জমির মত শুষিয়া লইল। তার পর "আরে আল্লা!" বলিয়া এমন একটী তৃপ্তিসূচক শব্দ করিল যেন বুঝা গেল তার মহাপ্রাণীটী মহাশান্তি লাভ করিল। কণ্ঠ সরস হইলে বৃদ্ধা তখন কিরণ ও নলিনীর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিল। বউটী তখন বদনার বাকী জলটুকু ছেলের মুখে দিয়া শেষে নিজে একটু পান করিয়া চাতালের শীতল সানের উপর শুইয়া পড়িল।

যজ্ঞেশ্বরী উপরে আসিয়া দৃশ্য দেখিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার শুভ্রসিক্ত বসন পরা স্নানোজ্জ্বল গৌরবর্ণ সৌম্য গম্ভীর মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া বুড়ী কথা বন্ধ করিল; তার ভয় হইয়াছিল বুঝি ইনি জমীদার বাড়ীর কেহ হইবেন বা। বুড়ী প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে নলিনীর দিকে তাকাইল, নলিনী বুঝিয়া উত্তর দিল—"এ আমার জ্যাঠাই মা, সহর হতে এসেছেন।" নলিনী বুড়ীর পরিচয় করাইয়া দিল—"জ্যেঠাই মা! এ এসমাইলের মা আর ও তার বউ, ওইটে ছেলে—"। যজ্ঞেশ্বরী বাধা দিয়া বলিলেন-"ছিঃ মা, ওইটে বল্‌তে হয় না, ওইটী বলো"। পরক্ষণেই ছেলেটীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন বৌ দিব্বি তোমার ছেলেটি তো—বেশ ঠাণ্ডা; ছেলেটী তখন ক্ষুধার আবদার জানাইয়া মাকে অপ্রস্তুত করিতেছে। যজ্ঞেশ্বরী কিছু পয়সা আঁচলে না বাঁধিয়া পথে ঘাটে বাহির হইতেন না। কয়েকটী পয়সা অলক্ষ্যে বাহির করিয়া নলিকে ডাকিয়া চুপি চুপি কি বলিলেন। নলি চাতালের পাশেই যে দোকান ছিল সেখানে ছুটিয়া গেল। এদিকে মা ও মেয়ে বুড়ীর সঙ্গে কথা আরম্ভ করিলেন।

য। কোথা থেকে আসছ তোমরা

বু। তালিবপুর হতে মা, ঐঠেঁয়ে আমার বহিন্ থাকে তার বাড়িকে গিয়েছিনু মা! আর খোদাতাল্লা কি ঠাঁই রেখেছে মা!—

য। কেন? তোমাদের বাড়ী তো। এই গাঁয়ে নদীপারে না?

বু। ঘর বাড়ী কি আর দুষমনে রেখেছে, মা! মানুষ যার দুষমন হয়

মা খোদাতালাও তার দুষমণি করে! (কপালে করাঘাত করিয়া) কাঙ্গাল গরীবের নসীবে বা সবাই দুষমন!

ব্যাপারটা কি যজ্ঞেশ্বরীর মনে খোলসা হইতেছিল না। নলিনী একটা ঠোঙ্গা করিয়া বাতাসা কিছু ও নারকেলের লাড়ু কয়েকটা এবং গামছার কোণে বাঁধিয়া চারটী মুড়কী আনিয়া জ্যাঠাইএর কাছে ধরিল। যজ্ঞেশ্বরী বুড়ীকে ও তার বৌ নাতিকে কিছু কিছু ভাগ করিয়া দিয়া খাইতে অনুরোধ করিলেন। এই অপ্রত্যাশিত দয়া ও মমতার পরিচয়ে বুড়ী ও বৌ অবাক হইয়া গেল। তাহাদের অন্তরাত্মা ক্ষুধার তাড়নায় জ্বলিয়া যাইতেছিল শুধু খাদ্য অভাবেই পুকুরের জলে উদর পূর্ণ করিয়াছিল। বুড়ী আগ্রহে মিষ্টান্ন হাত পাতিয়া লইয়া বৌ ও নাতিকে ডাকিয়া ভাগ করিয়া দিল। সভ্য সমাজের কৃত্রিম ভব্যতার তারা ধার ধারিত না; কাজেই "থাক্ থাক্, না-না, এসব কেন" প্রভৃতি শিক্ষা-বিকৃত ছদ্মভাবের মৌখিক মিথ্যাবাণী তাহারা বলিল না; বরং বলিল "এ দুষমন গাঁয়ে কে মা তুমি! বাঁচালে, মা; খিদেয় বাছাটীর জান্ যাচ্ছিল!"

য। দুষমন গাঁ কেন গা?

বু। (এদিক ওদিক তাকাইয়া) দুষমনের গাঁ বৈ কি মা; গাঁয়ের জমীদার রাজা যদি দুষমন্ হয় তা হলে সবাই তাই হয় মা! কেউ কাছে এসে না, আহা বলে না! সাধ করে কি গাঁ ছেড়েছিনু মা?

য। কেন কি হয়েছিল!

ন। ওদের ঘর কে পুড়িয়ে দিয়েছিল জ্যাঠাইমা—

য। (বিস্ময়ে) কে? কে গা?

বু। আর কে মা? শত্তুর দুষমনে! রাজা জমীদারই শত্তুর, ওরাই দুষমন! আর কে—

য। কেন?

বু। অনেক কথা, মা! অনেক কথা! কাজ কি মা কাঙ্গালের কথায়?

য। আচ্ছা শুনবো এখন; তুমি খাও আগে—

বু। না মা! আমি খাবো? আমার ছেলের আগে জান বাঁচুক! এসমাইল আমার ফিরে এসুক তখন খাবো—এ মুখে খাবার দেবো কোন লাজে মা? হে দুষমন—হে শত্তুর! আরে আল্লা!

বুড়ী কাঁদিতে লাগিল—অঝোরে চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল। মা ও

মেয়ে দু'জনেই বুঝিল গ্রামের জমীদারের কোনো গুরুতর অত্যাচারে এই দরিদ্র অসহায় অনাথ গুষ্টীটার এই দুর্দ্দশা।

কিরণ। মা গো মা! যে গাঁয়ের কথাই শুনি জমীদারের অত্যাচারের গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে আর কাগজে পড়তে পড়তে সারা হয়ে যাই!

য। জমীদার না ঘরের ঢেঁকী কুমীর সব! ও গাঁয়েরও এই ভাগ্‌গি!

যজ্ঞেশ্বরী লক্ষ্য করেন নাই যে পুরোহিত-পত্নী ও সাহা-ঘরণী পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া উপরে উঠিয়াছে। যজ্ঞেশ্বরী অনেক পূর্ব্বে স্নান সারিয়া উঠিয়াছেন, তবু চাতালে এত দেরী কেন? কি ব্যাপার? ইত্যাদি জানিবার নিমিত্ত উভয়ে কৌতূহলে দমফাটার মত হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া তাই পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে আসিল। যজ্ঞেশ্বরী বুড়ীর কথায় ও নিজের ভাবে মগ্ন ছিলেন, পরের গতি বিধির অত শত খেয়াল করেন নাই। যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়। যজ্ঞেশ্বরী-কৃত জমীদার মন্তব্য পুরোহিত পত্নীর কানে গেল। উহাদের দেখিয়াই যজ্ঞেশ্বরী কিরণকে ও নলিনীকে কাছে টানিয়া লইয়া পথ ছাড়িয়া দিলেন। চাতালের উপর উপস্থিত হইয়া দুই জনকেই বিশেষতঃ পুরুৎ গিন্নি মুখটা বিকৃত করিয়া পায়ের কাপড় হাঁটুর উপর তুলিয়া, কেবল মাত্র আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে মুসলমানী দু'জনকে ইঙ্গিত করিয়া তিরস্কার করিলেন;—"এ যে এসমাইলের মা দেখ্‌ছি! এ কি বাছা তোদের কাণ্ড? মুছল্‌মানের? মেয়ে তোরা হিঁদুর ঘাটে এসেছিস্, তা এক পাশে বসলেই তো পারতিস্? না, গোটা চাতালটা জুড়ে—কি এল্লং কাণ্ড মা!—

সাহাপত্নী। দেখো ঠাকুরুন! সব এঁটো পড়ে—ছিঃ! বল মা—

পুকি।—ও মা সত্যিই তো? ছিঃ ছিঃ কি মুছ্লমেনে কাণ্ড গো! কি সব গোস্ত ফোস্ত খাচ্ছে নাকি গো? ছিঃ মা ছিঃ ছিঃ—

নলিনী। গোস্ত কেন খেতে যাবে? সন্দেশ বাতাসা খাচ্ছে দেখছুনী—

পুগি। হ্যাঁলো হ্যাঁ থাম্ ভোলার মেয়ে বুঝি? কথা শিখিছিস্ তো খুব। (সাহা পত্নীকে) দেখো বাছা—এই সব পায়ের দাগ মাড়িওনি যেন—মাগো হিঁদুর ঘরেও জাতবিচের নেই মা—

কিরণ আর থাকিতে পারিল না। কি বলিতে যাইতেছিল। যজ্ঞেশ্বরী চোখ্ টিপিয়া দিলেন। পুরোহিতপত্নী ও সাহাগৃহিণী কোনো মতে শুচি ও আচার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সরকারি পথ ছাড়িয়া নেউগীদের নারিকেল বাগান

দিয়া বাড়ী ফিরিলেন। বুড়ীর বিশ্রাম শেষ হইলে সেও বৌ ও নাতি লইয়া উঠিল।

যজ্ঞেশ্বরী ও কন্যাদের লইয়া উহারই সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাঁহার কৌতূহল এখনো চরিতার্থ হয় নাই। পথে যাইতে যাইতে আবার কথা তুলিলেন:—

য। গিছলে কোথা?

বু। রাজাগাঁর হাঁসপাতালে মা—ছেলে সেখানে আধমরা হয়ে পড়ে আছে দেখতে গেছনু মা—আর যাব কোথা—

য। কি অসুখ? হাঁসপাতালে কেন?

বু। তবে শোনো মা—দুষমনের গাঁ, মা, কথা বলতে সাহস পাইনে—

য। তা হোক্ আমি তো দুষমন নই তুমি বল—

বু। না মা তুমি কেন দুষমন হবে! খোদা তোমার ভাল করুক মা—

য। ছেলের কি হয়েছে?

বু। দুষমনে মা ঘরে আগুন জ্বেলিয়ে দেয় তাই নিবুতে গিয়ে ছেলে আধ পোড়া হয়ে অজ্ঞেন হয়ে যায়—

য। কে ঘর জ্বালিয়ে দেয়—

বু। দুষমনে, আবার কে গায়ের রাজাই দুষমন—

য। কেন?

বু। তবে শোন মা মোর নানীর ছেলে ইব্রাহিম; তাকে জমীদার বল্লে তোকে সাহেবের খানার এঁটো পরিষ্কার করতে হবে—তা মা সে বল্লে মুই তা জান গেলেও পারবোনা—হারামের গোস্ত খেলে সাহেব, মুসুলমানে তা ছোঁবে মা? তা সে করেনি। তাই জমীদার দরোয়ান দিয়ে তাকে আধমারা করে মা! সে রোখা জোয়ান ছেলে। জমীদারের নামে নালিশ করে—হা খোদা! খোদার কি চোখ আছে মা—

য। তার পর?

বু। তার পর মা মোর ছেলে এসমাইল সাক্ষী দেবে বলে—সে নিজ চোখে দেখেছ্যালো কিনা—তা শুনে জমিদারের সুমুন্দী চৌধুরী—এসমাইলকে ডেকে মানা করে বল্লে—তুই সাক্ষী দিতে পাবিনি তা এসমাইল খুব রোখা মরদ, সেও বল্লে মা আমি সাক্ষী দিবুই—মাথার উপর খোদা থাকৃতে মিছে বলবুনি; আবার মোর জাত ভাই যখন বিপদে পড়েছে মুই তাকে বিপদে ভেসিয়ে যাব?

কিরণ। বাঃ বেশত! গরীব হলে কি হবে মা? মনের তেজ দেখ?—

বু। হ্যাঁ মা যেমনি বুকের পাটা তেমনি তেজ মা—তা মা খোদা কি দেখলে? সেই রাগে মা ছেলের ঘর জ্বেলিয়ে দিলে—ছেলে তো আধপোড়া হয়ে হাঁসপাতালে পড়ে আছে—আমি মা বহিনের বাড়ী এদের নিয়ে আছি, আবার সেখেনে যাচ্ছি মা;

কিরণ। কখন পৌঁছুবে?

বু। সেই বিকেল সাঁজ হবে মা! মরদরা এক পহরেই চলে যায়- এই ছেলে নিয়ে বুড়ো মানুষ মা প্যাটে ভাত নেই—

য। তা এসমাইলের মা! আজ এ গাঁয়ে থাক, খাওয়া দাওয়া করে কাল যাবে?—

বু। দুষমন গাঁয়ে? না মা—ঘর কোথা?

য। এ বেলা আমার ওখানে খেয়ে যাবে—রাত্তিরে থেকে কাল যাবে—

বুড়ী কিংকর্ত্তব্য বুঝিতে না পারিয়া অন্যমনা হইয়া বধুর দিকে তাকাইল! বৌটী আনন্দে ইচ্ছা জানাইল। স্নেহক্ষুধার্ত্ত বিরহী অনাদৃত মন কোথাও একটু আন্তরিক স্নেহ মমতা যেখানে পায় সেই খানেই বশীভূত হইয়া পড়ে। এই আধ ঘণ্টার আলাপে বুড়ী ও বুড়ীর পুত্রবধু এই মাতৃহৃদয়া রমণী দুটীর পায়ে তাদের কৃতজ্ঞতা পুর্ণ ভক্তিসরস প্রাণ দুটী লুঠাইয়া দিয়াছিল। ভগবানের সংসারে অন্তরের ভালবাসা দিয়াই আপন পর বিচার হয়। আমাদের সংসারে আমরা কিন্তু রক্তের যোগ দিয়াই আপন পর নির্ণয় করি। অথচ পদে পদে আমাদের মাপ কাঠি বা বিচার লক্ষণের ভুল দেখি, তার ফলভোগ করি, তবু আমাদের চোখ খোলে না। ইশা, মুশা, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি বড় বড় Prophet বা অবতারগণ কেন যে সব ভুলিয়া প্রেমের রাজ্য প্রচারেই ব্যস্ত হইতেন—মতের রাজ্য গঠনে নয় তা বেশ বোঝা যায়। "ভাল বাস, সকলকে ভালবাসে, ভালবেসে পরকে আপন কর, পরের জন্য মর, মরে বাঁচ—এতেই মুক্তি" এই তাঁদের ছিল একমাত্র শিক্ষার মন্ত্র। কিন্তু তাঁদেরই প্র-পরা-অপ এবং উপশিষ্যরা তাঁদেরই শিক্ষার দোহাই দিয়া মানুষকে ঘৃণা করিবার, পায়ে ঠেলিবার এবং দলিবার কেমন সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন! এই বাঙ্গালা দেশ প্রেম-সন্ন্যাসী গৌর নিতাই এর শিষ্য বলিয়া গর্ব্ব করে! যে মহাপ্রভুরা হরিদাস যবনকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন জগাই মাধাই যে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন সেই মহাপ্রভুদের আধুনিক ভক্ত শিষ্যরা এমনি এক ছুঁৎ-মার্গ

গঠন করিয়া অপর সব নিম্নজাতিকে অস্পৃশ্য কলঙ্কে দাগী করিয়া রাখিয়াছেন যে দেখিলে শিহরিতে হয়; মনেই হয় না এই দেশেই মাত্র তিন শত বৎসর আগে এক দিগ্বিজয়ী মহাপ্রেমিক প্রেম বন্যা বহাইয়া ছোট বড় সাধু অসাধু; পণ্ডিত মুর্খ, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যকে সকলকে এক স্রোতে ভাসাইয়া ডুবাইয়া মাতাইয়া একাকার করিয়া দিয়াছিলেন! আদর্শের এমন অধঃপতন, আচারের এমন ব্যাভিচার ধর্ম্মের এমন-ধর্ম্মনাশ কোনো দেশে এরূপ হইয়াছে কিনা জানি না।

যজ্ঞেশ্বরী বুড়িকে ও তার বৌ নাতিকে লইয়া নিজের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। পরম সমাদরে দাওয়ার উপর একটা কম্বল বিছাইয়া তাহাদের বসাইয়া কাপড় ছাড়িতে গেলেন।

বুড়ী বসিতে ইতঃস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া কিরণ বলিল, "তা হোক, বসো—কম্বলের আসনে দোষ নেই—বসো ভাই!" বউটী অপ্রত্যাশিত ভাই' সম্বোধনে অভিভূত হইয়া পড়িল। তার চোখ ভিজিয়া উঠিল।—

পাড়াগাঁয়ের ছোট সীমার মধ্যে কোন গৃহস্থ কি করে তা বেশীক্ষণ অপরের কাছে অজ্ঞাত থাকে না! সৌদামিনী রান্নাঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিল এসমাইলের মা দাওয়ার উপর কম্বলাসনে পরম আদরে উপবিষ্ট! এর আগে গেরস্থর ছোটখাটো কাজ কর্ম্মের উপলক্ষে এসমাইলের মা কতবার এ বাড়ীতে আসিয়াছে কিন্তু এমনতর আদর তো সে কখনো পায় নাই! একে গরীব চাষাভুষা তাতে মুসলমান জাতি! হিঁদু বাউন বিধবার বাড়ী এমন অভ্যর্থনা! বুড়ী যেন একটু কেমনতর হইয়া গেল! বিশেষ সৌদামিনীকে দেখিয়া!—সে যেন Apologyর সুরেই বলিল "গিন্নিমা ছাড়লেনা যে মা, তাই এসে বসনু!"। সৌদামিনী বুঝিল দিদির কাণ্ড—সে অন্য কিছু না বলিয়া বলিল "তা বেশ তো, বসো বসো, এসমাইল তো হাঁস পাতালে? কেমন আছে? ফিরে এসেছে?—

বু। না মা! ভাল আছে, তবে উঠতে হেঁটতে পেরেনি, হপ্তা বাদে ছাড়ান পাবে গো।

সৌ। কোথা আছিস বউ নাতি নিয়ে?

বু। তালিবপুরে মা, বহিন বাড়ীতে—। আর খোদা ঠাঁই রেখেছে কি?

যজ্ঞেশ্বরী বুঝিয়াছিলেন তার এই উদ্ভট অভ্যর্থনা ব্যাপারে সদু হয়তো একটু ক্ষুন্ন হইবে; তাই সাফাই করিবার জন্য, বাহিরে আসিয়াই বলিলেন—সদু শুনিছিস ব্যাচারীর দুঃখের কথা।

স। আমরা তো দিদি আগে হতেই সব জানি !

য। তা ঠাকুরপো আর সেই বা কি করবে ?

স। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করবে এমন কি ক্ষমতা তার দিদি ?

য। তা তো বটেই, সদু , ওদের নেমতন্ন করে এনেছি আহা ব্যাচারীরা সমস্ত দিন কিছু খায়নি ! না খেয়েই বাড়ী ফিরছিল, ধরে এনেছি—

স। বেশতো দিদি, তোমার যুগ্‌গি কাজ করেছ।

সদুর হৃদয় এক নবীন অনাস্বাদিত প্রীতি ও ভক্তিরসে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল। ভালবাসা এমনি ছোঁয়াচে রোগ !

বাড়ীর সকলেই যেন একটা স্বর্গীয় আনন্দে ও উৎসাহে ভরিয়া উঠিল। অতিথি নারায়ণের পুজার উৎসবে গৃহস্থের প্রাঙ্গণটী যেন অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিল !

এমন সময় আমাদের পুর্ব্বপরিচিত যশোদা দেবী পুত্র কোলে পাড়া বেড়াইতে বাহির হইয়া মুখুয্যে বাড়ী প্রবেশ করিল। যশোদা বাড়ী ঢুকিয়াই মুসলমানীদের রকে কুটুম্ব আদরে উপবিষ্ট দেখিয়া অবাক হইয়া গেল ! তার যেন বসিতে পা উঠিল না। যজ্ঞেশ্বরীকে দেখিয়া কৌতুহল দীপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এ আবার কি বউদি ?

য। কি আবার ?

পাছে ব্যাচারীদের অসম্ভ্রম সূচক কোনো কথা যশোদা বলিয়া ফ্যালে এই ভয়েই আগে হইতেই বলিলেন—আমি ভাই এদের নেমতন্ন করে এনেছি—"

যশোদা। তা ভাল ! পাল পার্ব্বনের দিন কুলিন বাউন পেয়েছ ভাল—

য। হঁ্যা দিদি ভগবানের গড়া মানুষ—সব জীবের কুলীন তো বটে !

যশোদা। হিঁদু বাউনের বাড়ী ঘর—

য। যার যেমন রুচি প্রবৃত্তি দিদি ! ওর ছিষ্টিকর্ত্তা আর আমার ছিষ্টিকর্ত্তা কি আলাদা ভাই ; সে যাক্—ছেলের কি হয়েছে ? আহা কালী মূর্ত্তি যে ?

যশোদা। হঁ্যা ভাই আজ দুদিন হতে পেটের অসুখ জ্বর। এই দুধ খাওয়ানু তা বমি করে ফেল্‌লে—

য। পেটের অসুখে দুধ দিলে কেন ? ও যে বিষ—

যশোদা। আর কি ই বা দেব বল।

যশোদার কিন্তু আর বলিবার বা গল্প করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। ব্রাহ্মণের বিধবার বাড়ীর এই অনাচার কাণ্ডে তার সনাতন আচার বুদ্ধি একেবারে

হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। এই অদ্ভুত বার্ত্তা বাড়ী বাড়ী প্রচার করিবার জন্ত তাহার উদরাধ্মান ঘটিবার উপক্রম হইল। সে একটা অছিলা করিয়া ফিরিবার উপক্রম করিল।

যশোদা। যাই ভাই রোগা ছেলে নিয়ে আর বস্‌বোনা—

যজ্ঞেশ্বরী বুঝিলেন যে যশোদাদেবী রুগ্ন পুত্রের মঙ্গল চিন্তায় কতদূর উতলা হইয়াছে। মনোভাব চাপিয়া বলিলেন—তবে এস, দুধ দিওনা, ছেলেকে বারলি বা এরারুট যা হয় দিও, দুধে আরো পেট্ খারাপ করবে"—।

যশোদা। জানিতো ভাই, তা ওসব ঝন্‌ঝট্ করে কে ? দোকান হতে এলো তো বারলি হবে—? যাই দেখি"। যশোদা চলিয়া গেল।

কিরণ হাসিয়াই অস্থির। বলিল—"পাড়া বেড়ানো বা পরচর্চ্চার ঝন্‌ঝট সয়, ছেলের সেবা শুশ্রূষার ঝন্‌ঝট্ সয় না - ধন্যি বাবা !"

যশোদা বাড়ী ফিরিবার পথে যতগুলি সাথীর অনাত্মীয়ের বাড়ী ছিল সব বাড়ীতে ঢুকিয়া যজ্ঞেশ্বরী দেবীর অনাচার কীর্ত্তি অতিরঞ্জন যোগে বর্ণনা করিয়া প্রায় দুই প্রহর অতীত করতঃ ভিটায় পদার্পণ করিলেন।

বার্ত্তা শুনিয়া ছেলে বুড়া, ছুড়ী বুড়ী যে যেথায় ছিল কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া মুখুয্যে বাড়ীতে ঢুকিয়া চক্ষু কর্ণের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া গেল। যাইবার সময় মন্তব্য অমন্তব্য যে দু একটা প্রকাশ না করিয়া গেল তা নয়। সৌদামিনী প্রথমতঃ অপবাদ ভয়ে কিছু সন্ত্রস্তা হইয়াছিল কিন্তু দিদির অপূর্ব্ব ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া চুপ করিয়া গেল.। সেও যেন বুকে বল ভরসা পাইয়াছিল।

রান্না বান্না শেষ হইলে যজ্ঞেশ্বরী পরম যত্নে বুড়ীকে ও তার বৌ ও নাতিকে সেই রকে বসাইয়া তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন। এমন সময় ভোলানাথ ও পুরুৎ বাড়ীর এক প্রতিবেশিনী এক বর্ষিয়সী বিধবা বাড়ী ঢুকিলেন। ভোলানাথ এসমাইলের মাকে ভোজননিরতা দেখিয়া অবাক হইল। সে সমস্ত পুর্ব্বাহ্ন বাড়ীতে ছিল না। নিকটের এক গ্রামে খড় কিনিতে গিয়াছিল। পথে বর্ষিয়সীর সঙ্গে দেখা হয়। বর্ষিয়সী লোকমুখে যজ্ঞেশ্বরীর কীর্ত্তিকাহিনী শুনিয়া ব্যাপার দেখিতে আসিতেছিল। ভোলানাথের সঙ্গে দেখা হইতে বলিল, 'ছোট বউএর কাছে একটু কাজ আছে বাবা তাই যাচ্ছি।' ভোলানাথ বলিল 'বেশ তো চল।'

বর্ষিয়সীর নাম ইচ্ছাময়ী। লোকে তাকে ইচ্ছা ঠাকরুণ বলিত। ইচ্ছা-ঠাকরুণ যজ্ঞেশ্বরীর অতিথি সেবা দেখিয়া অবাক। নাক সিট্‌কাইয়া বলিলেন

"তোমাদের বাছা সব বাড়াবাড়ী, মুছুরমান খাওয়াবে তো উঠোন ছেল তো! আবার নিজেদের ঘর কন্নার ঘটী বাটী নোংরা করেছ?"

য। তাতে কি মা? বেরাল কুকুরেও তো ঘটী বাটীতে মুখ দেয়!

ই। ওরা যে মুছুরমান গো! কি কথা মা তোদের?'

য। মানুষ তো বটে মা! কুকুর বেরালের চেয়ে তো ভাল?

ই। সে কি গো? ধর্ম্মাধর্ম্ম জাতবিচারে তো আছে?

য। জাত বিচের কি গরীব গেরস্থর বেলায় বাছা? তোমাদের জমীদার বাবু যে বাড়ীতে সাহেব এনে শুয়োর গরু খাওয়ালে তাতে তাদের জাত যায় নি?

ই। ঝগড়া করতে তো আসিনি বাছা। যার যা রুচি পিরবিত্তি হবে করবে—

য। তবে আর কেন? কথা তুল্লেই কথা শুনতে হয়—

ই। ছোট বউ কোথা'লো?

সদু বাহির হইয়া আসিল।—'কেন গা পিসি?'

ই। সেই পঁইতের পয়সা কটা দিতে পারবি মা?

সদু দু আনা পয়সা আনিয়া ইচ্ছাময়ীকে দিতে গেল। ইচ্ছাময়ী সরিয়া গিয়া বলিল—"রাখ ওই থেনে বাছা, ছুঁসনি যত তোদের খিষ্টানী কীর্ত্তি!"—সদু হাসিয়া মাটীতে পয়সা কটী রাখিয়া দিল। ঠাকরুণ তুলিয়া লইয়া আঁচলে বাঁধিয়া চলিলেন। মৃদু হাসিয়া কিরণ বলিল—'নেয়ে যেও ঠান দি—ছোঁয়া পয়সা।' ইচ্ছাময়ী ব্যঙ্গটুকু বুঝিল। বক্তার একবার মাত্র আক্রোশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

ভোলানাথ ইত্যবসরে যজ্ঞেশ্বরীর কাছে সব কথা শুনিয়া লইল। 'হাঁ' 'না' কিছু না বলিয়া সে তেল মাখিতে বসিল। যজ্ঞেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন—"কি ঠাকুরপো? খুব চটেছ?"

ভো। কে? আমি? না—চটবো কেন বৌদি?

য। ম্লেচ্ছ কাণ্ড করছি?

ভো। আমি চটিনি তবে গাঁয়ে একচোট খুব ঢি ঢি পড়ে যাবে—

য। ভয় হয়েছে তা হলে?

ভো। ভয় আর কি? তবে একটা কথা জমীদার বাড়ীর কাজকর্ম্ম নিয়ে খোঁটা দিলে—জানই তো।

য। ঘর জ্বালিয়ে দেবে? তা দিক্। তুমি নেয়ে এসে খেতে বসো। যজ্ঞেশ্বরী অতিথি সেবায় মন দিলেন। ভোলানাথ স্নানে গেল।

ভোজনান্তে তৃপ্ত হইয়া বুড়ি নাতি লইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। বৌটি গিয়া এঁটো স্থান পরিস্কার করিয়া ঘটী বাটী মাজিয়া উঠানের একপাশে রাখিল। তাদের ছোঁয়া বাসন হিন্দুর ঘরে কি করিয়া উঠিবে ভাবিয়া সে লজ্জিত ও চিন্তিত হইতেছিল। যজ্ঞেশ্বরী বলিলেন "নাও মা এসে জিরোও, ও থাক্ ওই খেনে; গঙ্গাজল ছুইয়ে আগুন ঠেকিয়ে নিলেই শুদ্ধ হবে—তুমি এস।"

বৌটী নিশ্চিন্ত হইয়া আসিয়া বসিল।

বেলা পড়িলে তাহারা উঠিল। যজ্ঞেশ্বরীর জিদ সত্ত্বেও তারা ফিরিতে ব্যস্ত হইল। যজ্ঞেশ্বরী গত্যন্তর না দেখিয়া বলিলেন—"তা এস্‌মাইলের মা এসমাইল হাঁসপাতাল হতে ফিরে এলে যেন দেখা করে—আমার খালধারের বাগানে জায়গা দেব, ঘর তুলে থাক্‌বে, সব গাঁ ছাড়া হবে কেন? আমার ঝাড়ের বাঁশ দেব ঘর তুলো।"—

বুড়ী কি বলিবে কেবল নির্ব্বাক হইয়া তাকাইয়া রহিল। চোখে শুধু ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। অনেক পরে বলিল, "এসমাইল ফিরে এসেই তোমাদের পায়ের ধুলো নে যাবে মা খোদা তোমাদের ভাল করবে"

বুড়ী উঠিল। যজ্ঞেশ্বরী ঘরে ঢুকিয়া দুটী টাকা ও সের কয়েক চাল, কিছু আনাজ তরকারী সমেত বুড়ীকে আনিয়া দিল। বুড়ী পরম ভক্তিভরে জলভরা চোখে প্রীতির দান লইয়া সাষ্টাঙ্গে গড় করিয়া বিদায় হইল।

বুড়ীর ও তার বৌ দুজনেরই বুক কুলে কুলে ভরিয়া উঠিয়াছিল এবং দুজনেরই চোখ্ ছাপাইয়া পড়িল।

উহারা চলিয়া গেলে, যজ্ঞেশ্বরী বাসনগুলি আগুন ছোঁয়াইয়া ঘরে তুলিল। সদু বুঝিতে পারিল সোণার স্পর্শে সেও সোণা হইয়া উঠিতেছে।

ক্রমশঃ

বাঁশী

(শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী)

বাঁশের বাঁশী নয় তো শুধু বাঁশের বাঁশী নয়
লক্ষ যুগের কান্না হাসি ওই বাঁশীতে রয়।
বন্ধ ঘরে রইল যারা বন্ধ বহুদিন
চক্ষে মনে আঁধার টানি মুক্তি-মুখহীন—
মুক্ত হল শান্তি পেল ভ্রান্তি হল দূর
শুন্‌তে পেয়ে মনে প্রাণে বাঁশের বাঁশী সুর।
হাজার বছর পার হয়েছে হাজার রাজা শেষ
ইতিহাসের বক্ষে তারি মিলবে দেখ লেশ,
কতই ওঠা কতই নামা ধূলায় হল লয়
বাঁশীর সুর যায় কি ভোলা! সম্ভব কি হয়?

রাধার প্রাণে ফাগুন আনে যখন বাঁশী বাজে
মন যে তার ব্যাকুল করে বিঘ্ন ঘটে কাজে
বাঁশীর সুরে উজান বহে যমুনারি জল
কাঁটার বনে কুসুম ফোটে মধুর নিরমল।
চাঁদনি রাতে নাচনি হাওয়া কুসুম হতে ফুলে
বাঁশীর সুরে অবস হয়ে কেবল পড়ে ঢুলে।
শ্রাবন মেঘে আঁধার নামে দিগন্তের কূলে
স্বপন মায়া জড়িয়ে দিয়ে বর্ষা রাণীর চুলে ;—
মন যে তার উদাস করে মুখ যে হয় ভার—
শুন্‌লে পরে বাঁশীর সুর কেবল বার বার
ওরে আমার প্রাণের বাঁশী
না হয় তুই ওরে
কারো হাতে বাঁশের গড়া
বাঁশীর রূপ ধ'রে

ব্যাকুল সুরে ওঠ্‌রে বেজে
বনের তীরে তীরে
সুরটি তার লাগুক এসে
আমার বুক ভরে—
বাইরে মোরে—নিক সে টানি
মুক্তি যেথা ভাসে
বংশীধারীর নীলসাগরের
শুভ্র ফেণা রাশে।

আন্তর্জাতিক চিরন্তন শান্তি তাহার উপায় ও সম্ভাবনা।

(শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশগুপ্ত এম, এ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জাতীয় সংঘ গঠনের প্রস্তাবটি এক নূতন মহাবিষ্কারের ন্যায় জগতে একটা আনন্দের উৎস ছুটাইয়া দিয়াছে—পৃথিবীব্যাপী একটা আন্দোলনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, যেন চারিদিকে আনাকদুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সত্যই কি ইহা একটা নূতন আবিষ্কার? প্রকৃত পক্ষে এই League of Nations বা জাতিসংঘের পরিকল্পনাটি এক অতি প্রাচীন সংস্কারের নূতন অভিব্যক্তিমাত্র। সেই প্রাচীন কাল হইতেই কিরূপে দেশে শান্তিরক্ষা করিতে পারা যাইবে এবং কিরূপেই বা যুদ্ধের বিভীষিকা কতকটা দূর করা যাইবে এই উদ্দেশ্যে অবিরত প্রয়াস চলিয়াছে। প্রাচীন গ্রীসে যে এ চেষ্টা পরিণতির দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন আছে। প্রথমতঃ একটা Congress of states বা রাষ্ট্রসমিতি ছিল, দ্বিতীয়তঃ ছিল, একটা পররাষ্ট্রদ্বারা মধ্যস্থতার ব্যবস্থা বা Arbitration of States ; যেমন Sparta (স্পার্টা) ও মেসিডোনিয়া পরস্পর বিবাদোন্মুখ হইলে এথেন্স হইল তাহাদের মধ্যস্থ। এইরূপে ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির সকলের পক্ষেই মধ্যস্থতা-বিধি প্রচলিত ছিল। কি সমাজগত কি ব্যক্তিগত সকল আদর্শের মূলই ছিল তখন শান্তি। মধ্যযুগে

যখন নরহত্যা বা ছোট বড় যুদ্ধ একটা দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে গণ্য ছিল, তখন লোকে শান্তি পাইবার জন্য আশ্রয় লইত ধর্ম্মমন্দিরের অভ্যন্তরে। সেই সময়-কার সামাজিক উন্নতি বা চিন্তাস্রোতের ধারার অনুসরণ করিলে মনে হয় যেন League of Nations বা জাতিসংঘের পরিকল্পনাটি—তখনও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মধ্যযুগের ধর্ম্মযাজকগণ মানবের এই যুযুৎসু ভাব দমন করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহারা অধঃপতিত ও প্রপীড়িতের উদ্ধারের জন্য নিঃসহায়ের সাহায্যকল্পে ও আর্ত্তের পরিত্রাণ মানসে শক্তির নিয়োগ করাইতেন, এইরূপে শক্তির সাধনা বা পরাক্রম প্রদর্শন ধর্ম্মের একটা অঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছিল। রোমের অভ্যুদয়ের দিনে Pope বা তৎকালীন খ্রীষ্টজগতের প্রধান ধর্ম্ম যাজকই ছিলেন আন্তর্জাতিক বিচারক এবং কোনও মারাত্মক রকমের বিবাদ উঠিলে বিভিন্ন রাজ্যের বা জাতির তিনিই মধ্যস্থতা করিতেন। এইরূপে পোপের সুসময়ে যখন অসীম শক্তির তিনি অধীশ্বর ছিলেন, তখন প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিসমূহের মধ্যে আপনার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি বিচার করিতে পারিতেন; তখন কেবল মানবপ্রীতি, ন্যায়শক্তি ও শান্তিস্থিতিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। আবার সেদিন যখন ফরাসী দেশে রাজপ্রাধান্য অসহ হইয়া উঠিয়া মহাবিপ্লবের সৃষ্টি করিল, তখনও সেই ফরাসী বিপ্লবের অভ্যুদয়ে য়ুরোপে এই কথা জাগিয়াছিল। কিন্তু সারা জগৎকে একসূত্রে বাঁধিবার কল্পনা ফ্রান্সে জাতিগঠন করিয়াই তখনকার মত নিবৃত্ত হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও সেই কল্পনার ধারা বহিয়া আসিয়াছে; জাতিধর্ম্ম ও রাষ্ট্রধর্ম্মকে অতীতের সঙ্কীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধিজনিত বলিয়া অনেকের ধারণা জন্মিয়াছে। তাঁহারা বলেন বিজয়দৃপ্ত সেনাপতি যখন সগর্ব্বে বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া অরিদল মথিত করিয়া ছুটে তখন সে স্বজাতির মূঢ় অহঙ্কার ও দাম্ভিকতার প্রতিমূর্ত্তি। স্বদেশের সীমারেখা লইয়া ধরাবক্ষ বিদীর্ণ করিবার প্রয়াস অর্থবা বর্ণবৈষম্য ও আচারবৈষম্য লইয়া পণ্ডিত মূর্খের কোলাহল, সে শুধু অজ্ঞতা ও সঙ্কীর্ণতার নামান্তর।

চিরস্থায়ী শান্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া Kant কতকগুলি প্রাথমিক উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, রাজ্যরক্ষার্থ স্থায়ী বেতনগ্রাহী সৈন্য উঠাইয়া দিতে হইবে, সাধারণ অস্থাবর সম্পত্তির মত কোনও রাজ্য হস্তান্তরিত করিলে চলিবে না, রাজ্যের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কোন গোলমাল হইলে বাহিরের রাজ্য তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না,

যুদ্ধের জন্য জাতির নামে ঋণগ্রহণ বন্ধ করিতে হইবে—যুদ্ধাসক্তিদমনের পক্ষে ইহা অনেকটা কার্য্যকরী হইবে। আর সর্ব্বশেষে তিনি বলেন, বাণিজ্যের প্রসারের সহিত সকল দেশ একই স্বার্থসূত্রে বদ্ধ হইলে চিরস্থায়ী শান্তিস্থাপনের পথ অনেকটা সরল হইয়া যাইবে। মহাত্মা কোম্‌তও এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—বিশ্বমানবের সেবাই ইহার একমাত্র সমাধান। পরিবার জাতি বা রাষ্ট্রের স্বার্থ যেখানে বিশ্বমানবের মঙ্গলের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে বিশ্বহিতে সমুদায় স্বার্থবলিদানে সঙ্কোচ করিলে চলিবে না। মানুষ কেবল মানুষ বলিয়াই প্রেমাস্পদ এ জ্ঞানটা সর্ব্বপ্রথমেই বদ্ধমূল করিতে হইবে। কিন্তু দুই চারিজন মহানুভব ব্যক্তির মনে এ ভাব ফুটিয়া উঠিলেও, জন সাধারণের উপর ইহার আধিপত্য বিস্তৃত হয় নাই। সকল বিরোধ ও অশান্তির মূল যে দর্প, কাম ও কামনা, তাহার উৎপাটন এ পর্য্যন্ত হইল কৈ? এ তিমির দূর করিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন জ্ঞানের আলোক, সে আলোক বিস্ফুরিত হইবে ধর্ম্ম ও প্রেমের প্রদীপ হইতে। স্বাধীনতা ও সাম্যের কথা অনেক আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপন কতটা অগ্রসর হইয়াছে? মোটকথা—মানুষকে যদি প্রকৃত মহত্ত্বের পথ দেখাইয়া দেওয়া না যায়, মনের গ্লানি ধৌত করিবার প্রয়াস যদি না পাওয়া যায়, তবে ভ্রাতৃত্ব-ভাব স্থাপনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ মানুষ যদি ভাবে যে সে তাহার স্বেচ্ছাচারিতার পথে চলিয়া বেশ সুখ পাইতেছে, তবে প্রেমসাধন সে করিবে কেন?

কিন্তু যখন য়ুরোপের রাজনীতি-গগনে প্রকাণ্ড ঝড় উঠিয়া অনেক চিন্তা ও মানসিক ভাবের ওলট পালট করিয়া দিয়া গেল, তখন এই টুকরা টুকরা কল্পনা ধারা একত্র জমাট বাঁধিয়া মানুষের মনে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া বসিল। বাস্তবিক সেই সকল আলোচনা ও শিক্ষার দ্বারা সাধারণ স্তরের লোকেরও মানসবীণা এমন একটা উঁচু সুরে বাঁধা হইয়া গেল যে যেমনই এখন League of Nations বা জাতি-সংঘের প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছে অমনি উহা সহসা প্রহত হইয়া বাজিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপনের প্রশ্নটা প্রাচীন রাজনীতিবিদ্‌গণের পক্ষে যেমন তত কঠিন ছিল না, এখন তেমনি এ প্রশ্নটা ভীষণ জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তখন ছিল কেবল এক ধর্ম্মাবলম্বী খ্রীষ্ট য়ুরোপ লইয়া কথা, কিন্তু এখন নূতন মহাদেশ আমেরিকা আসিয়া জুটিয়াছে এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিষম সমস্যা হইয়াছে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ও আচার সভ্যতা দ্বারা

বিচ্ছিন্ন প্রাচ্যের সম্পর্ক লইয়া। অবশ্য যখন জাতি ধর্ম্ম ও সভ্যতা ভিন্ন হইয়াও এবং সাত সমুদ্র তের নদীর পারে অবস্থিত হইয়াও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গগুলি মোটের উপর এমন সুন্দর মিলিয়া রহিয়াছে তখন আশা হয় আন্তর্জাতিক চিরন্তন শান্তিটা নেহাৎ স্বপ্ন নয় এবং সেই মিলন সেতুর কতকটা যেন এখনই বেশ দৃঢ়রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ ইতিহাসের সাক্ষ্য লইলে মনে হয় যে এই জাতি সংঘের ধারণাটা ক্রমেই যেন স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইয়া আসিতেছে, সভ্যতাবিকাশের মূল হইতেই যেন ইহার ক্রমাগত প্রয়াস চলিয়াছে; এবং হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ইহা বিশ্বকে রাগ্‌বিতণ্ডা ও যুদ্ধবিগ্রহের হাত হইতে ত্রাণ করিতে পারিবে। ইহাই যে সকল প্রয়াসের চরম পরিণতি এবং ইহার জন্যই যে এই ভীষণ জীবনসংগ্রাম ও ক্ষুদ্রলাভের রাজ্যে মানবাত্মা থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে।

আসল কথা চিরস্থায়ী শান্তির প্রশ্নটা বড়ই জটিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এতগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হয় যে, এক এক সময়ে মনে হয়—সমগ্র জাতিটার শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়া আসিয়াছে। তাই অনেকে ইহা আদৌ কার্য্যকরী হইবে কি না এ বিষয়েই সন্দেহ করেন। তাঁহারা বলেন মানুষের চিত্ত চাঞ্চল্যটা এত বেশী এবং অসদ্‌বৃত্তি ও স্বার্থপরতাটা এত প্রবল যে হয়ত কার্য্যকালে কোন কোন রাজ্য একটা সংঘ বা সমিতির হস্তে আপনাদের ভবিষ্যৎ সুখ শান্তি অর্পণ করিয়া স্থির থাকিতে অস্বীকৃত হইতে পারে। অবশ্য উহারা স্বার্থসাধনের জন্য প্রথম প্রথম সর্ত্তাবদ্ধ থাকিতে সম্মতি দিবে সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রয়োজন হইলেই চুক্তিপত্রকে a mere scrap of paper বা একটা বাজে কাগজ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারে এবং তখনই যে কল্পনাসৌধটি গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, তাহা সহসা সশব্দে ভূমিসাৎ হইয়া উহার আশ্রয়ে নিঃশঙ্ক শয্যায় সুষুপ্ত লোকগুলিকে একবারে মৃত্তিকা-প্রোথিত করিয়া ফেলিবে। জগতে যখন এরূপ ব্যবহারের বহুসাক্ষ্য রহিয়াছে এবং এখনও যখন সেই দাম্ভিকতার ব্যত্যয় ঘটে নাই তখন এমন ধারণা কিছু ভ্রান্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না; কারণ ইহা খুবই সত্য যে মানুষ যতদিন না অসৎ কামনার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, ততদিন সংসারে অমঙ্গল থাকিবেই সুতরাং যুদ্ধও থাকিবে। এই যে য়ুরোপের বক্ষ মথিত করিয়া একটা মহাপ্রলয় বহিয়া গেল, কতজন কত অর্থ সেই মহাস্রোতে ভাসিয়া গেল, এত করিয়াও য়ুরোপ আসিয়া দাঁড়াইল কোথায়?

রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংগ্রাম বাধিয়া, পুরাতন রাষ্ট্রসম্বন্ধ একেবারে ওলট-পালট হইয়া গেল; প্রাচীন রাষ্ট্রশক্তি হতবল ও প্রনষ্টগৌরব হইয়া নিরাশার গভীর অন্ধকারের মাঝে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মানুষের সব গিয়াও ত তাহার উচ্চাশা লোভ ও কামনা যায় না। রাজত্ব নাই, রাজশক্তি নাই, অথচ পরাজিত জাতির রাজ্যলোভ নষ্ট হয় নাই। দল বাঁধিয়া গোপনে গোপনে কত আয়োজন, কত ষড়যন্ত্র চলিতেছে। জাতিতে জাতিতে অসূয়া ও বিদ্বেষ প্রধূমিত হইয়া অন্তরের মাঝে এক ধূমায়মান সমরবহ্নি লুকাইয়া রাখিয়াছে, কেবল একটা সময়োপযোগী ফুৎকারের অপেক্ষা মাত্র। এইত গেল য়ুরোপের আন্তর্জাতিক অবস্থা। যুদ্ধ ত হইয়া চুকিয়াছে, কিন্তু পুনরাবির্ভাবের আশঙ্কা যায় নাই। যুদ্ধের সময় শোনা গিয়াছিল বটে সকলেই যুদ্ধের চিরবিরামসাধনের জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং ইহাই নাকি সভ্যজাতির ইতিহাসে শেষ যুদ্ধ। হয়ত যুদ্ধের মাঝখানে সরলভাবেই এরূপ সঙ্কল্প করা হইয়াছিল, কারণ বিপদে পড়িলে মানুষ অশেষ প্রকার সাধু সঙ্কল্পই করিয়া থাকে; কিন্তু আজ এ কল্পনা ত ছায়াবাজির মত লয় পাইতে বসিয়াছে, কেই বা গ্রাহ্য করে আর কেই বা আমল দেয়। যুদ্ধের আশঙ্কা ত শেষ হয়ই নাই, বরং বাড়িয়া চলিয়াছে, এইরূপই ত অনেকের ধারণা। অবশ্য সন্ধি-সংসদ্ বসিয়াছিল, তাহার কাজও হইয়াছে, সন্ধিও স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু সন্ধি আর শান্তি ত এক নয়। সন্ধি চায় যুদ্ধের সেই সময়কার মত বিরাম, আর শান্তির উদ্দেশ্য সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার করিয়া যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার পর্য্যন্ত নিবৃত্তি সাধন। এইরূপ শান্তি য়ুরোপে এখনও সুদূরপরাহত। কারণ ইহাই যে য়ুরোপের বর্ত্তমান অবস্থায় অনিবার্য্য। আমাদের শাস্ত্রে বলিয়াছে যে একমাত্র ত্যাগ ও প্রেমের দ্বারা শান্তিলাভ হয়, শান্তির অন্যপথ নাই। য়ুরোপে সে ত্যাগের শক্তি কই? এই জন্যই ত শান্তির বৈঠক উঠিতে না উঠিতেই একটা ভাগাভাগি ব্যাপার চলিয়াছে, তবে ইহা লইয়া যে এখনও একটা যুদ্ধ বাঁধে নাই, তাহার কারণ প্রবৃত্তি থাকিলেও শক্তি কোথায়? আত্মরক্ষায়ই যে সকলে এখন ব্যতিব্যস্ত। তাই ত দেখি League of Nations বা জাতিসংঘগঠনের সর্ত্তগুলির প্রথম খস্‌ড়া ও শেষ খস্‌ড়ার মধ্যে কত প্রভেদ—ধর্ম্মের শাসন আর বন্ধুর উপদেশে যতটা ব্যবধান। এ যেন ঠিক অমৃত ভাণ্ডারের লোভ দেখাইয়া সাধারণ মিষ্টান্ন বিতরণের ব্যবস্থা।

অবশ্য এই যুদ্ধের শিক্ষার ফলে য়ুরোপের জাতীয়জীবন ক্রমে ক্রমে নূতন

ভাবে গঠিয়া উঠিতে পারে ; তবে অনেক সময় দুঃখের দিনের অর্জ্জিত জ্ঞান সুখের দিনে মনে থাকে না। বিপদের সময় করুণাকাতর আঁখিই বিপদ কাটিয়া গেলে ভ্রুকুটি করিতে দ্বিধা করে না। আন্তর্জাতিক মিলন হয়ত সুব্যবস্থার মধ্যে আসিতে পারে, কিন্তু মানুষের অন্তর গ্লানিদূর করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কেবল বাহিরের ব্যবস্থায় স্থায়ী সুফলের আশা একটা মস্ত ভ্রম। অন্তরের প্রেরণাই ত বাহিরে ফুটিয়া উঠিবে। মানুষের প্রাণে যতদিন না মিলনের আকাঙ্ক্ষা তীব্র ভাবে ফুটিয়া উঠিবে, ততদিন শুধু কঠোর নিয়মের পেষণে তাহার স্বার্থবুদ্ধিকে নিস্তেজ করিয়া রাখিয়া শান্তি স্থাপনের চেষ্টা একেবারেই পণ্ডশ্রম। এই জন্যই ধর্ম্মশিক্ষা ও পরমার্থশিক্ষার প্রয়োজন। সাধারণ স্তরের মানুষকেও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎসে স্নাত করিয়া আসিতে হইবে। মানবদেহের ক্ষণভঙ্গুরতা ও পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অস্থিরতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। মানব জীবনে সুখই যখন আদর্শ তখন বুঝাইতে হইবে প্রকৃত সুখ কিসে? কামাত্মতা একেবারেই প্রশংসার যোগ্য নহে। সেই দুষ্পূর্য্য কামনা ও প্রলয়ঙ্করী হিংসা ত্যাগ করিয়া আর্ত্ত ও পীড়িতের দুঃখনিবারণের প্রয়াসে এবং জ্ঞান রাজ্যের নূতন নূতন বিজয়ের চেষ্টাতেই ত সুখ। ধর্ম্মদ্বেষও দূর করা চাই, ভ্রাতৃভাবের আলোক আসিলে এই ঘনান্ধকার দূর হইবে ও সকলেই বুঝিবে যেমন সব মানুষ এক ঈশ্বরের সন্তান, সেই রকম সব ধর্ম্ম এক বিশ্ব-ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত। তখনই একটা সুন্দর ভ্রাতৃপ্রেম জাগিয়া উঠিবে। সেই 'প্রেমের রাজ্যে সুন্দর কুৎসিত নাই, জাতিভেদ নাই। তার গৃহ প্রভাতের উজ্জ্বল আকাশে। সে একটা স্বচ্ছ স্বতঃ উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্য। মৃত্যুর উপর বিজয়ী আত্মার মত, ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্ত্তনের উপর মহাকালের মত, সে সঙ্গীত অমর।" নীচ স্বার্থ, রূঢ়তা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা ও বিজাতিবিদ্বেষ দূর না হইলে চিরস্থায়ী শান্তিস্থাপনের সুখস্বপ্ন নিশ্চয়ই ফলিবে না। সত্য সত্যই তার ভিত্তি হইবে ভালবাসা। আপনার স্বার্থ ডুবাইয়া দিয়া ক্রমে ভাইকে, জাতিকে. মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাসিতে শিক্ষা করিতে হইবে। তখন জাতির ভবিষ্যৎ আপনিই গড়িয়া উঠিবে। জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়া হয় না, জাতীয় উন্নতির পথ ভ্রাতৃভাবের মধ্য দিয়া, ভ্রাতৃহত্যায় নহে। কবি মিল্টনের অমর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারা যায় Who overcomes by force, hath overcome but half his foe—অর্থাৎ হৃদয়জয় শক্তি প্রয়োগে হয় না, ভাইএর মত ভালবাসিয়া আপনার করিতে পারিলেই

চরম জয়লাভ। ইহাই আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান উপায়। বঙ্গের প্রেমের ভিখারী চৈতন্য তাহা বুঝাইয়া গিয়াছেন, সাধক বিবেকানন্দ সর্ব্বসমন্বয়ের মন্ত্র ছড়াইয়া এই ভাবেরই উদ্বোধন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন ; তাহাই জগতের আদর্শ না হইলে শান্তির কল্পনা স্বপ্নতুল্য রহিয়া যাইবে। জগাই মাধাইয়ের মত পরম চেষ্টাকেও যখন সৎপথে আনিবার ইচ্ছা জাগিবে, তখনই পৃথিবীতে যুদ্ধের অবসান হইবে, তাহার পূর্ব্বে নয়। যদি কখনও জগতের সকল লোকে বলদর্প ভুলিয়া বলিতে পারে—

ঘুচাতে চাস্ যদি রে এই হতাশাময় বর্ত্তমান ;
বিশ্বময় জাগায়ে তোল ভায়ের প্রতি ভায়ের টান ;
ভুলিয়ে যা রে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর ;
বিশ্ব তোর নিজের ঘর—আবার তোরা মানুষ হ'।

বাস্তবিক তখনই এই জটিল তত্ত্বের কত সহজ মীমাংসা পাওয়া যাইবে। অনেকে হয়ত বলিবেন যে, এইরূপ মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠা একটা Utopian idea বা মস্তিষ্কবিকার জনিত কল্পনা মাত্র, কিন্তু ইহাও তেমনি সত্য যে এ চেষ্টা সফল হওয়া চাইই। কারণ যুগ যুগান্তরের সভ্যতাকে এক নিষ্ঠুর পরাক্রম-সম্ভূত দাম্ভিকতার হস্তে সমর্পণ করিতে সকলেরই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে এবং যখন চিরন্তন শান্তি স্থাপন করিতে পারিলে যাহা এতদিন কেবল স্বার্থসাধনে ও নরহত্যাব্যাপারে নিয়োজিত ছিল, মন কত শক্তি একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া এক অভূতপূর্ব্ব উচ্চাঙ্গের মানবসমাজ গড়িয়া তুলিতে পারে, তখন পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি এবং পররাজ্যসম্বন্ধে নিঃস্বার্থভাব উদ্বুদ্ধ করিতে সকলেই চেষ্টা করিবে সন্দেহ নাই। সেই নবভাবের উদ্বোধনের জন্য এতকাল পরে সকলেই বলদর্পী পাশ্চাত্য ক্ষত্রশক্তিতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া আসিবে এই পরমার্থচিন্তার পীঠস্থানে এই সংযম তিতিক্ষার তপোবনে—

যেথা একদিন বিরামবিহীন
মহা ওঙ্কার ধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে,
উঠেছিল রণরণি।
তপস্যা বলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া

বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনত শিরে—
এই ভারতের মহামানবের-
সাগর তীরে।

পথ

(শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী)

পরম প্রেমে ধরতে বুকে সইবি শত জ্বালা;
বরণ ক'রে নিবি দুঃখে প'রতে সুখমালা।
মলিন মুখে সাজবে ভাল পরের সুখে হাস;
মনের কথা বাজবে ভাল পেলে ব্যথার শ্বাস।
পুলক দিয়ে ভ'রতে হৃদি পাগল সাজে সাজ;
দৈত্যতরী নেগো বেয়ে শান্তি-সাগর-মাঝে।
ধ্রুবলোকের পথটী সে যে বিশ্বপদে লুটা;
অমৃতরে আনতে ধেয়ে বিপদপানে ছুটি।
আঁধারখানির বক্ষ হতে ধরগো চেপে আলো।
সত্যজীবন সেথায় যেথা মৃত্যু দারুণ কালো॥

শরৎ সাহিত্যে মাতৃভাব।*

(শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ)

প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থ সমূহ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আর্টের যে সকল উপাদান থাকায় তাঁহার উপন্যাস এত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে, তন্মধ্যে তাঁহার অসাধারণ সহানুভূতির আবেগই সর্ব্বপ্রধান। এই সহানুভূতি আছে বলিয়াই, সমাজের শাসন ও বিধি নিষেধের জন্য যে সকল প্রেম নিষ্ফল হইয়া করুণ কাহিনীর সৃষ্টি করিতেছে, তাহার বেদনা-সঙ্গীত শরৎচন্দ্র সাহিত্যের মন্দিরে যেরূপ গভীর ও স্পষ্টসুরে গাহিয়াছেন, তেমন আর কোন ঔপন্যাসিক পারেন নাই। কিন্তু শরৎচন্দ্র, প্রেমের এই নিষ্ফলতা ও তাহার কারণ মাত্র প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; বিবিধপ্রকারের বিভিন্ন সমাজের আদর্শ ও বিধি আমাদের সমক্ষে ধরিয়া তিনি আমাদের সামাজিক সমস্যার বিচার ও মীমাংসা করিয়াছেন। ইহা শরৎ বাবুর অসামান্য প্রতিভার অন্যতম কীর্ত্তি। কিন্তু এই সকল সামাজিক সমস্যা ছাড়া, তিনি তাঁহার অসাধারণ প্রীতি ও সহানুভূতির দ্বারা গৃহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যে সকল স্নেহ ও বাৎসল্য রসের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এবং ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার জন্য সেই স্নেহ-বাৎসল্য যে দুঃখ ও ত্যাগের উপাদান হইয়াছে, তাহা তিনি তাঁহার সুনিপুণ তুলিকায় এমন অদ্ভূত ধরণে বিকশিত করিয়াছেন, যাহা বঙ্গ সাহিত্যের অভিনব সম্পদ ও শরৎচন্দ্রের অক্ষুণ্ণ কীর্ত্তি। বস্তুতঃ সাহিত্য ও সমাজ বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং শরৎচন্দ্র যে সমস্ত সামাজিক সমস্যা আমাদের চোখের সামনে ধরিয়াছেন, তাহা ভাবিবার বিষয় এবং 'শ্রীকান্ত' প্রভৃতি গ্রন্থে আজকালকার মস্ত সমস্যা —Rights of Women—সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু যেহেতু এগুলি সামাজিক ব্যাপার, ইহাতে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং শরৎচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলির মূল্য এবং প্রভাব কতকটা দেশ ও কালের উপর নির্ভর করে। এবং সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহাদেরও

* কলিকাতা "নীতিশিক্ষা প্রদায়িনী সভা ও সুহৃদ লাইব্রেরী" হইতে "স্বর্ণমণি পদক" পুরস্কার প্রাপ্ত।

বর্ত্তমান প্রভাবের পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু শরৎচন্দ্র বাৎসল্য রস ঢালিয়া 'রামের সুমতি' 'মেজদিদি' প্রভৃতি গল্পে যে মাতৃহৃদয়ের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার মূল্য বা প্রভাব দেশ-কাল-পাত্রের উপর নির্ভর করে না, কারণ এই স্নেহ বাৎসল্য মানব হৃদয়ের চিরন্তন বৃত্তি এবং যেহেতু 'The same heart beats in every human breast, (Matthew Arnold), ইহাদের প্রভাব সর্ব্বত্র, সকল সময় এবং সকল মানব হৃদয়েই সমান। এই জন্যই তাঁহার 'মেজদিদি' প্রভৃতি গল্পের ভারতবর্ষের বাহিরে London Timesও এত প্রশংসা করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে এই মাতৃভাব দেখানই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ আজকালকার লেখকগণের অধিকাংশই দাম্পত্য ও স্বাধীন প্রেম লইয়াই ব্যস্ত ; একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'ছুটী' গল্পছাড়া আমাদের সাহিত্যে বাৎসল্য-রসের নিদর্শনের নিতান্ত অভাব ছিল, শরৎচন্দ্র বঙ্গ সাহিত্যে, সেই বাৎসল্যরস প্রচুর পরিমাণে ঢালিয়া দিয়া অমৃতের স্রোত বহাইয়াছেন। শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে' 'রামের সুমতি' 'মেজদিদি' 'নিষ্কৃতি' প্রভৃতি গল্পে এবং 'শ্রীকান্ত' 'অরক্ষণীয়া' 'পল্লীসমাজ' প্রভৃতি উপন্যাসে, তাঁহার এই অভিনব মাতৃভাব বিশেষভাবে বিকশিত হইয়াছে। কোন্ গল্পে ও উপন্যাসে কিরূপ ঘটনার ভিতর দিয়া এই মাতৃভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, নিম্নে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

তাঁহার 'রামের সুমতি' 'বিন্দুর ছেলে', 'মামলার ফল' 'মেজদিদি' ও 'নিষ্কৃতি'তে আমরা দেখিতে পাই যে, পরের ছেলের প্রতি স্নেহপরায়ণা নারীর ভালবাসা, অভিমান ও পারিবারিক কলহের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে।

১। নারায়ণী—(রামের সুমতি)

'রামের সুমতি' গল্পের পাড়ার সেরা দুষ্টছেলে রাম, শ্যামলালের বৈমাত্র ভাই। শ্যামলালের স্ত্রী নারায়ণীর বয়স যখন ১৩ বৎসর, তখন রামের মা তাঁহার আড়াই বছরের পুত্র রামের ভার এই বালিকা বধূর হস্তে দিয়া পরলোকে গমন করেন। অন্য মেয়ে যে সময় পুতুল খেলা করে, সেই সময় হইতে পুতুলের পরিবর্ত্তে নারায়ণী তাঁহার এই দেবরটীকে মানুষ করিয়া আসিতেছে। এই গল্পে শরৎচন্দ্র সন্তানতুল্য রামের প্রতি, মাতৃসমা বৌদিদির বাৎসল্য দেখাইয়াছেন।

অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে, নারায়ণীর একটী পুত্র হইয়াছে, তাহার নাম গোবিন্দ। রাম আমাদের এখন ১৬।১৭ বছরের হইয়াছে। কিন্তু রাম

বৌদিদির অসাধারণ স্নেহের মধ্যে থাকিয়া এখনও ছোটবেলাকার মতই আছে। এতবড় বয়সেও সে নিজের হাতে ভাত খাইবে না, বৌদিদি হাতে করিয়া না খাওয়াইয়া দিলে তাহার খাওয়া হইবে না। তজ্জন্য পাড়ার লোকের নিকট নারায়ণীকে কত গঞ্জনা ও টিট্‌কারী সহ্য করিতে হয়। তাছাড়া, রামের দুষ্টামীর জন্যও তাহাকে কত কথা সহ্য করিতে হইত। নারায়ণী রামকে শাসনও করিত কিন্তু সে শাসন মায়েরই মত - বৌদিদির একবারের শাস্তিতে যে টুকু কষ্ট হইত, তাহার শতগুণ আদর পাইয়া রাম সে শাস্তির কথা ভুলিয়া যাইত। স্নেহ-বিহ্বলা নারায়ণীর বড় দুঃখ এই যে—'পাড়ার লোকে কেবল আদরটাই দেখে, শাসনটা দেখে না।' কিন্তু এই মাটীর শাসন কিরূপ, তাহা এই ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে। একদিন শসা চুরী করার অপরাধে নারায়ণী রামকে একপায়ে দাঁড়ানর শাস্তি দিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যখন দেখিল যে, রাম কোঁচার খুঁট দিয়া ঘন ঘন চোখ মুছিতেছে, তখন নারায়ণীর মাতৃহৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, সে বলিল "আচ্ছা, যা, হয়েছে, এমন আর করিসনে।" কাজেই স্পষ্টবাদী নেত্যকালী বলিয়া উঠিল—"আর শাসনও ভারী! ছেলে এক মিনিট একপায়ে দাঁড়িয়ে কেঁদেছে ত পৃথিবী রসাতলে গেছে।' নারায়ণী-রামের এই স্নেহ ভালবাসার চিত্র আরও পরিস্ফুট হইয়াছে, যেদিন হইতে নারায়ণীর মা দিগম্বরী তাহাদের শান্তির মধ্যে আসিয়া পা দিয়াছে। নারায়ণী রামকে কোনদিন পর ভাবে নাই, কিন্তু দিগম্বরী আসিয়া অবধি রামকে বিষ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন ; এবং নারায়ণী যেদিন মায়ের মুখে শুনিল "কেন, বাড়ী কি ওর (রামের) একলাকার।" সেইদিন নারায়ণী মায়ের বুকের ভিতরট স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া, বোধকরি, বড় ভয় খাইয়াছিল।

মাতৃসমা এই বৌদিদির প্রতি রামের ভালবাসা যে কত গভীর, তাহা শরৎচন্দ্র সামান্য দুই একটি ঘটনা দ্বারা অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। দিগম্বরী ঠাকরুণ যেদিন 'শকুনি-হাড়-গোড়ের' ভয়ে, রামের কত সাধের অশ্বত্থগাছটী উঠান হইতে তুলিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিলেন, সেদিন রাম চীৎকার করিয়া রাগিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু অনন্যোপায় হইয়া নারায়ণী যখন তাহাকে বুঝাইল, "মঙ্গলবার দিন অশ্বত্থগাছ পুঁতলে বাড়ীর বড় বৌ ম'রে যায়" তখন রাম বৌদিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'কিন্তু ফেলে দিলে আর দোষ নেই—না, বৌদি?" আবার যেদিন রামের খাওয়া লইয়া মা ও মেয়ের মধ্যে খুব ঝগড়া হইয়া গেল, সেদিন নারায়ণী উপবাসী রহিল। রাম

নেত্যর কাছ হইতে মুড়ী লইয়া বাহিরে গেল। কিন্তু সে মুড়ী তাহার মুখে উঠিল না, তাহার কতবার মনে হইতে লাগিল, বৌদি উপোষ করিয়া আছে—সে তখনই মুড়ি গুলি জলের উপর ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল।

নারায়ণীর বাৎসল্যও কত গভীর, তাহা শরৎচন্দ্র একটী কথায় অতি সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। দিগম্বরীর ব্রাহ্মণ খাওয়াইবার দিন রাম যখন কিছুতেই তাহার কার্ত্তিক গণেশ মাছ দুটীর একটীকেও ধরিতে দিল না, তখন দিগম্বরী চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"কবে ছোঁড়া মরবে যে, আমার হাড়ে বাতাস লাগবে—যেন তে রাত্তির না পোহায়।' এই অভিশাপ কাণে যাইবা মাত্র নারায়ণী বিদ্যুদ্‌বেগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "মা"। যতই হউক দিগম্বরীও ত মা,—সন্তানের মুখে এই 'মা' কথাটী শুনিয়া দিগম্বরীর অন্তরাত্মা বোধ করি কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। শরৎচন্দ্র সামান্য এই 'মা' কথাটীর দ্বারা যে মনস্তত্ত্বের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে চরিত্রটী জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা বোধ হয় মনস্তত্ত্বের এমন সুন্দর ইঙ্গিত প্রকাশ করিতে পারা হাইত না।

কিন্তু রামের ছোঁড়া কাঁচা পেয়ারাটা যে দিন দিগম্বরীকে না লাগিয়া নারায়ণীকে আঘাত করিল, সেই দিন শ্যামলাল দিব্যি দিয়া স্ত্রীকে বলিলেন "—যদি ওকে খেতে দাও, যদি কোন দিন কথা কও, যদি কোন কথায় থাক, সেই দিনে যেন তুমি আমার মাথা খাও।" এই বলিয়া তিনি সেই দিনই রামকে পৃথক করিয়া দিলেন। পরদিন রাম নিজের পৃথক রান্নাঘরে কাঁচাভাত রাঁধিয়া শুধুই তাহা খাইতেছে, একথা যখন নারায়ণীর কাণে পৌঁছিল, তখন তাহার মাতৃহৃদয়ে কান্না ঠেলিয়া বাহির হইবার জন্য মাথা ঠুকিতেছিল, কিন্তু নারায়ণী কিছু করিলেন না, শুধু নিজে উপোস করিয়া রহিলেন। কিন্তু তাহার পর দিন রাম রাঁধিলও না, খাইলও না, কারণ আজ দুইদিন তাহার বৌদিদি তাহাকে ডাকে নাই, তাহাকে বকে নাই। সারাদিন ভাবিতে লাগিল, পেয়ারাটার আঘাতে বৌদিদির কত না লাগিয়াছে। এই ভাবিয়া সে একটা কাঁচা পেয়ারা লইয়া নিজের কপালে একশ বার ঠুকিয়া ঠুকিয়া দেখিতে লাগিল, তাহাতে কতটা ব্যথা লাগিতে পারে। এমন অনিন্দ্যসুন্দর করুণচিত্র আর নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। অবশেষে সে মনে করিল, যদি কোথাও চলিয়া যাই, তা'হলে হয়ত বৌদি সুখী হইতে পারেন, এই ভাবিয়া রাম স্থির করিল—তাহার অজানা অচেনা মামার বাড়ী চলিয়া যাইবে।

এ দিকে গোপনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নারায়ণীর জ্বর হইয়াছে। তিনদিন কাটিয়া গিয়াছে। নারায়ণী যখন শুনিল, কাল রাম রাঁধেও নাই, খায়ও নাই, তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না; প্রাতে উঠিয়াই রান্না চড়াইয়া দিল। তারপর যখন রাম তাহার সেই অজানা অচেনা মামার বাড়ী যাইবার জন্য বৌদিদিকে টাকা চাহিয়া পাঠাইল, তখন নারায়ণী ভোলাকে বলিল, "যা ভোলা শীগ্‌গির ডেকে আন।" রাম আসিলে নারায়ণী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া হইয়া সাজান ভাতের থালার নিকট বসাইল। কিন্তু কে-ই বা খাইবে, আর কে-ই বা খাওয়াইবে। রাম বৌদিদির কোলের মধ্যে মুখ লুকাইল, আর বৌদিদির অশ্রুবৃষ্টিতে রামের মাথা পিঠ ভিজিয়া যাইতে লাগিল। তিনদিন পূর্ব্বে তাহার স্বামী যে মাথার দিব্যি দিয়াছিলেন, একথা তাহার মনে ছিল, এই জন্যই সে তিনদিন নিজে খায় নাই, এবং রামকেও খাইতে দেন নাই, কিন্তু আর পারিল না; এবং তাহার মা যখন সেই খানটাতেই খোঁচা দিয়া বলিলেন, "যে এত বড় একটা দিব্যি দিলে, তার বুঝি হুকুমটাও একবার নিতে হবে না?" নারায়ণী এবার কঠিন হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি জানবে মা, কার কাছে কখন আমি হুকুম পেয়েছি?···যাকে বুকে ক'রে এতটুকুকে বড় ক'রে তুলতে হয়, সেই জানে হুকুম কোথা দিয়ে কেমন ক'রে আসে। এখন একটু সামনে থেকে সরে যাও, দুটো খাইয়ে দিই। ও আমার তিন দিন অনাহারে আছে।" বলিতে বলিতে নারায়ণীর চোখের জল টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল। আমরাও চোখের জলে আর পড়িতে পারি না,—চোখের জল মুছিয়া আবার যখন পড়ি, তখন দেখি,—নারায়ণী তাহার মাকে বলিতেছে, "তোমার খরচ পত্র আমি সমস্ত পাঠিয়ে দেব, কিন্তু এখানে তোমার আর থাকা হবে না।", আর, রাম আস্তে আস্তে বলিতেছে, "না বৌদিদি, উনি থাকুন, আমি ভাল হ'য়েছি।"

এমন বাৎসল্য-রস-অভিষিক্ত গল্প বাঙ্গালা সাহিত্যে আর নাই। ইংরাজ কবি Grey যেমন একমাত্র Elegyর জন্যই অমর হইয়াছেন, তেমনি শরৎচন্দ্র যদি এই একটী মাত্র গল্প—রামের সুমতি—লিখিতেন, আর কিছুই না লিখিতেন, তাহা হইলেও তিনি বঙ্গ সহিত্যে অমর হইয়া থাকিতেন। রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বলেন,—"প্রচলিত রাশি রাশি ছোট গল্পের করুণরস 'রামের সুমতি' গল্পের তুলনায় সিন্ধুর নিকট বিন্দু। নারায়ণী যেদিন স্বামীর শপথ উপেক্ষা করিয়া রামের জন্য রাঁধিতে বসিল, সেদিন তাহার মূর্ত্তি, রাফেলের অমর তুলিকায় আঁকা ম্যাডানো মূর্ত্তির ন্যায় আদর্শ মাতৃমূর্ত্তি।"

২। বিন্দু, (বিন্দুর ছেলে)

বিন্দুর ছেলে গল্পটীতে শরৎবাবু, অমূল্যর প্রতি তাহার খুড়ীমার অপরিমিত স্নেহ ও এই স্নেহবিবশা খুড়ীমার অপরিসীম বেদনা, অভিমানের মধ্য দিয়া পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

যাদব ও মাধব দুই জনে বৈমাত্র ভাই, কিন্তু থাকিতেন সহোদর ভাইএর মতই; এমনি তাঁদের মিল ছিল। যাদবের স্ত্রীর নাম অন্নপূর্ণা আর মাধবের স্ত্রীর নাম বিন্দুবাসিনী। বড় ভাই যাদবের একটী মাত্র পুত্র সন্তান ছিল; তাহার নাম অমূল্য। মাধবের কোন সন্তানই ছিল না। ছোটবউ বড় লোকের একমাত্র মেয়ে, সুতরাং তিনি ছিলেন একটু অতিরিক্ত অভিমানিনী। বড় বউএর মাথার উপর সমস্ত সংসারের ভারটা থাকায় তিনি ছেলে মানুষ করবার অবসর পাইতেন না। সে ভারটা ছোটবউ আসিয়া লইল; বিশেতঃ একদিন ছোট-বউএর ফিট হইবার সময় অমূল্যকে কোলে ফেলিয়ে দিয়া অন্নপূর্ণা দেখিলেন বিন্দু মূচ্ছার কবল হইতে রক্ষা পাইল। সেইদিন হইতেই অমূল্য বিন্দুর কাছেই থাকিত এবং বড়বউ ও একদিন হাসিতে হাসিতে বিন্দুকে বলিয়াছিল, 'অমূল্যকে তুই নে।' সেই যে একদিন অন্নপূর্ণা বিন্দুকে বলিয়াছিলেন, 'অমূল্যকে তুই নে' তারই জোরে একদিন অমূল্যধনের দুধ জ্বালদিতে দেরী হওয়ায় সামান্য দুই একটা কথা কাটাকাটি হওয়ায় অভিমানিনী বিন্দু বড়বউকে দিব্যি দিয়া ফেলিল, "তোমার অতিবড় দিব্যি রহিল দিদি যদি কোনদিন আর অমূল্যর দুধে হাত দাও। আমারও দিব্যি রহিল, আর কোনদিন যদি তোমাকে বলি"। এই দিব্যি দেওয়া ব্যাপারটা হইতেই বুঝা যায় যে, বিন্দু অমূল্যকে কত ভালবাসিতেন; বিন্দুর বাৎসল্য কত গভীর। এইরূপে শুধু অমূল্যকে টিপ পরান আর কাজল দেওয়া নিয়ে বিন্দুর দিনগুলি কাটিতে লাগিল। ক্রমে যথা সময়ে অমূল্যধনের হাতে খড়ি দিয়া তাহাকে পাঠশালায় পাঠান হইল; সেদিন বিন্দু ছেলেকে এমন করিয়া সাজাইলেন যে দেখিয়া ছেলের মা অন্নপূর্ণা, পাচিকাকে বলিলেন, "ছেলে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, তবু পেটে ধরেনি—তাহ'লে নাজানি ও কি করত।" ছেলেকে চোখের অন্তরাল করিয়াই বিন্দুর মনে হইল, বাড়ীতে পাঠশালাটা উঠাইয়া আনিলে হয় না! 'যদি কেউ ওর চোখে কলমের খোঁচাই দিয়ে দেয় তাহ'লে?" অন্নপূর্ণা সাতদিন সাতরাত বসে ভাবিলেও, এই খোঁচাখুঁচির কথা মনে করিতে পারিত না কিন্তু বিন্দুর তৎক্ষণাৎ তাহা মনে হইল, এমনই স্নেহময়ী বিন্দু। এই

রূপে 'ঐ কাল ভূতের মত ছেলেটাকে' লইয়া বিন্দুর দিন গুলি কাটিতে লাগিল। ক্রমে বিন্দু একেবারে ভুলিয়া গেল যে অমূল্য তাহার পেটের ছেলে নয়। এধারে ফল এই হইল যে অমূল্য তাহার মা, অন্নপূর্ণাকে 'দিদি', আর বিন্দুকে 'মা' বলিতে লাগিল। কিন্তু বিন্দু স্নেহান্ধ ছিলেন না, অতিরিক্ত আদরে ছেলেটীকে মাটী করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। 'ছেলেকে দশের একজন ক'রে তুলতে হ'লে যে রকম চোখে চোখে রাখতে হয় সেই রকমই করিতেন এবং 'ছেলে বড় হবে দশের একজন হবে' ঐ একটা আশা নিয়েই তিনি বেঁচেছিলেন। তাই একদিন বলিয়াছিলেন "না, দিদি ও আশায় যদি কোন দিন ঘা পড়ে, তবে আমি পাগল হ'য়ে যাব।" তাই যেদিন তাঁহার ঠাকুরঝি তাঁহার 'চওড়া-পাড়ের-কাপড় ফেরা দিয়ে পরা, 'দেখিবার মত টেরি ওয়ালা' পুত্র নরেনকে লইয়া এই গৃহস্থের মধ্যে আসিলেন, সেইদিন বিন্দুর মাতৃহৃদয়ে বড় ভয় হইয়াছিল। পাছে এই 'থিয়েটারে জ্যাকট করা' নরেনের সঙ্গে মিশিয়া তাহার অমূল্য খারাপ হইয়া যায়! তাই তিনি সর্ব্বদা অমূল্যকে আরও শাসনে রাখিতেন; এবং এই শাসন হইতে কেহ অমূল্যকে রেহাই দিবার চেষ্টা করিলে, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। তাই যে দিন আমপাড়ার অপরাধে স্কুলে অমূল্যর জরিমানা হইয়াছিল, এবং বিন্দুর ক্রোধ হইতে বাঁচাইবার জন্য অন্নপূর্ণা ছেলেকে লুকাইয়া টাকা দিয়াছিলেন, সেইদিন অন্নপূর্ণা অমূল্যর জন্য মাপ চাহিলে, অভিমানে ও ক্রোধে বিন্দু বলিয়া উঠিল, "আজ থেকে চিরকালের জন্যই মাপ করলুম, আর বলব না।" এই রূপে দুই একটা কথা হইতে হইতে বিন্দু অভিমানে ও ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহার মাতৃসমা দিদিকে বলিয়া ফেলিয়াছিল, "তুমি নষ্ট কর কার টাকা শুনি?" এই কথাটার পরিণাম এই হইল যে, দুই যাএর মধ্যে এমনি পাকা পাকি ঝগড়া হইয়া গেল যে বিন্দুর নুতন বাড়ীতে গৃহদেবতার পূজার দিন অন্নপূর্ণা নিজেও গেলেন না এবং তাঁহার স্বামী ও পুত্রকেও যাইতে দিলেন না। স্নেহময়ী বিন্দু অভিমানে যাহাই বলুক না কেন, তাঁহারা না আসায় তাঁহার মন গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিতেছিল; কোন কাজেই তিনি মন দিতেছেন না দেখিয়া, মাধব গিয়া অন্নপূর্ণাকে ডাকিয়া আনিলেন। বিন্দু তাঁহাকে দেখিয়া অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অমূল্যকে ডাকিতে গেলেও সে আসিল না। অনেক রাত্রে যখন অন্নপূর্ণা বাড়ী ফিরিতে উদ্যত হইলেন, তিনি জলস্পর্শ করেন নাই শুনিয়া বিন্দু অভিমানে যা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া এবং ভগবানের উপর

বিচারের ভার দিয়া, 'মুখে আঁচল গুঁজিয়া' কান্না রোধ করিয়া রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়াই উপুড় হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরদিনও বিন্দুর অভিমান যায় নাই; কখনও সে অন্নপূর্ণাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছিল, "ঐ একটী বংশধর—তার নাম ক'রে দিব্যি?" এদুঃখ তাঁহার রাখিবার জায়গা ছিল না, কিন্তু দিদি জলস্পর্শ করেন নাই তাহাতেও তাহার কম দুঃখ হয় নাই; তাই তিনি পাচিকাকে বলিলেন "রাগের মাথায় কে দিব্যি না করে, মেয়ে! তাই ব'লে জল স্পর্শ করলে না।"

অমূল্য এই কয়দিন বিন্দুর নূতন বাড়ীতে না আসিলেও সে বাড়ীর পাশ দিয়াই স্কুলে যাইত এবং বিন্দু 'লালছাতার আড়ালে' তাহার পরিচিত সেই চলনটী লক্ষ্য করিয়া তাহার মাতৃত্বের ক্ষুধা কতকটা মিটাইত। কিন্তু দুই দিন সেই ছাতাটী আর সেই চলন দেখিতে না পাইয়া বিন্দু নরেনকে ডাকিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। নরেন বলিল, "টিফিনের সময় সে দুটো ছোলা ভাজা নিয়ে যায়, আর আমার খাবার দেখে ছুটে এসে বলে, 'কি খাবার দেখি নরেন দা।'—তাই ও ঐ রকম করে নজর দেয় ব'লে মা মাষ্টারকে ব'লে দিয়ে ওর কান ম'লে দিয়েছে।" কথা কয়টী শুনিয়া বিন্দুর হৃদয় চুরমার হইয়া গেল; তাহার ছেলে অমূল্য টিফিনের সময় দু'টী ছোলা ভাজা ভিন্ন আর কিছু খাইতে পায় না। বিন্দু দুই দিন প্রায় উপবাস করিয়া রহিল, তারপর বাপের পীড়িত সংবাদে বাপের বাড়ী বলিয়া গেল।

আজ একমাস তাহার ছেলেকে বিন্দু দেখে নাই। কতদিন হইতেই যে বিন্দু অনাহারে নিজেকে ক্ষয় করিয়া আনিতে ছিল, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। বাপের বাড়ী আসার পর বিন্দুর জ্বর ক্রমশঃ এত বেশী ও মূর্চ্ছা এত ঘন ঘন হইতে লাগিল যে, তাহার আশা প্রায় ছাড়িয়া দিতেই হইয়াছিল। এমনি অবস্থায়—একদিন বিন্দু চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে তাহার স্বামীকে বলিল, "আমার সমস্ত অমূল্যের। শুধু হাজার দুই টাকা নরেনকে দিও, আর তাকে পড়িও, সে আমার অমূল্যকে ভালবাসে।"

কি অপরিসীম মাতৃস্নেহ! আজ অমূল্যর জন্য বিন্দুর হৃদয় গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল—তাহার অমূল্যকে নরেন ভালবাসে—তাই বিন্দু নরেনকে টাকা দিতে ও পড়াইতে বলিল। কি অনির্ব্বচনীয় স্নেহের চিত্র! ক্রমে মাধবের মুখে ঐ কথা যাদব শুনিলেন; তৎক্ষণাৎ যাদব, অন্নপূর্ণা ও অমূল্য আসিয়া বিন্দুর বাপের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বিন্দুর আর

মরা হইল না. তাহার ছেলে আসিয়াছে, তাহার অমূল্য আসিয়াছে, সে কি আর মরিতে পারে? তাই বিন্দু বলিল, "দাও, দিদি, কি খেতে দেবে। আর অমূল্যকে আমার কাছে শুইয়ে দিয়ে তোমরা সবাই বাইরে গিয়ে বিশ্রাম করগে, আর ভয় নাই—আমি মরব না।"

কি সুন্দর মাতৃমূর্ত্তি এই বিন্দু! কয়জন মা এই খুড়ীমার অপেক্ষা স্নেহশীলা হইতে পারেন! শরৎচন্দ্র এই চিত্রটী জীবন্ত করিয়াছেন, বিন্দুর গুণে দোষ মিশাইয়া। বিন্দু রক্তমাংসের জীব, তাহাতে গুণ আছে দোষও আছে। বিন্দুর অপরিসীম স্নেহ আছে, কিন্তু তাহার অতিমাত্রায় অভিমানও আছে। শরৎচন্দ্র চিত্রগুলি এইরূপভাবে জীবন্ত করিয়াছেন বলিয়াই, আমাদের মনে হয় যেন তাঁহার সৃষ্ট মানুষগুলি আমাদের সঙ্গে কথা কহিতেছে, মনে হয় সত্যই যেন বিন্দু আমাদের সামনে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "না ঠাকুরাণ, আমি মাথায় কাপড় রাখতে পারিনে, ছেলে বড় হয়েছে, মাথায় খোঁপা বাঁধলে দেখতে পাবে।" এই একটী কথায় শরৎচন্দ্র বিন্দুর মাতৃত্ব আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

৩। হেমাঙ্গিণী (মেজদিদি)

মেজদিদি নামক গল্পে শরৎচন্দ্র, পরের ছেলে যাহাকে বলে, সেই রকম পর কেষ্টর প্রতি 'মেজদিদি' হেমাঙ্গিনীর অনির্ব্বচণীয় মাতৃস্নেহ দেখাইয়াছেন।

যখন কেষ্টর মা মারা গেল, তখন জগতে আর কেহ নাই দেখিয়া, কেষ্ট আসিয়া তাহার বৈমাত্র বড়বোন কাদম্বিণীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কেষ্ট আসিয়া কিরূপ আদর পাইল, তাহা কাদম্বিণী যখন তাহার স্বামীর কাছে কেষ্টর পরিচয় দিতেছে তখনই সেই কথাগুলি হইতেই জানিতে পারা যায়। কাদম্বিণী স্বামীকে বলিতেছে, "তোমার বড় কুটুম গো, বড় কুটুম! নাও, খাওয়াও পরাও, মানুষ কর, পরকালের কাজ হোক।" কাদম্বিণীর বাড়ী আসিয়া অবধি কেষ্ট তিরস্কার ও অপমানের অবিশ্রান্ত আঘাত খাইতে লাগিল। কেষ্ট তাহার দুঃখী মায়ের নিকট আর কিছু না পাইলেও, পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পাইত। কিন্তু কাদম্বিণী দিদির বাড়ীতে সে যখন খিদের জ্বালায় কিছু বেশী ভাত খাইয়া ফেলিল, তখন কাদম্বিণী উচ্চহাস্য করিয়া কহিল, তবেই হয়েছে! এ হাতীর খোরাক নিত্য যোগাতে গেলে যে আমাদের আড়ত খালি হয়ে যাবে।" এই কথায় কেষ্টর বুকে অপমানের যে তীব্র শেল বিঁধিয়াছিল, তাহা এক অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। কিন্তু 'মেজদিদি' হেমাঙ্গিণীর সহিত প্রথম সাক্ষাতেই কেষ্ট যখন তাঁহাকে প্রণাম করিল, তখনই কেষ্ট হেমাঙ্গিণীর

আদরের আস্বাদ পাইল; হেমাঙ্গিণী কেষ্টর চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, "থাক্, থাক্, হয়েছে ভাই, চিরজীবি হও।" কেষ্ট মূঢ়ের মত তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল; এদেশে এমন করিয়া যে কেহ কথা বলিতে পারে ইহা যেন তাহার মাথায় ঢুকিল না। পরদিন হেমাঙ্গিণী যখন কেষ্টকে নিমন্ত্রণ করিয়া লুচি, রুই মাছের মুড়োর তরকারী, সন্দেশ, রসগোল্লা খাওয়াইল সেইদিন কেষ্ট বুঝিল, যে তাহার মায়ের মতনই স্নেহ সে আর একজন পরের কাছে পাইল ও পাইবে। হেমাঙ্গিণী তাহার কে? তাহার বৈমাত্রভগ্নীর যা বই ত নয়! তাই, "আজ থেকে আমাকে তোর সেই মরা-মা মনে করবি—একথা হেমাঙ্গিণী কেষ্টকে বলিবার পূর্ব্ব হইতেই, কেষ্ট হেমাঙ্গিণীকে মা বলিয়াই জানিয়াছিল। তাই খিদের সময় কেষ্ট হেমাঙ্গিণীর কাছে খাইতে চাহিয়াছিল, তাই সে বলিতে পারিয়াছিল—"কাল কিছু খাইনি মেজদি—কেষ্ট তাহার মেজদিদিকে কত গভীরভাবে ভাল বাসিত, তাহা তাহার সেই পেয়ারা আনা হইতেই বুঝা যায়। একদিন হেমাঙ্গিণীর সর্দ্দিজ্বর হইয়াছিল, এই সংবাদ পাইয়া কেষ্ট নিজের বুদ্ধির সাহায্যে সমস্ত দুপুরটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার মেজদিদিকে গোটাদুই কাঁচা পেয়ারা আনিয়া দিল। কেষ্টকে কেহই বলে নাই যে, হেমাঙ্গিণী পেয়ারা খাইতে চাহিয়াছে, তবুও মেজদিদির জ্বর হইয়াছে শুনিয়াই কেষ্ট এই অসময়ে কাঁচা পেয়ারা আনিয়া দিল, এই চিত্রের চমৎকারিত্ব বলিয়া বুঝানো যায় না। কিন্তু এধারে কেষ্টর জন্য মেজবউএর কোন দরদ কোন যত্ন কাদম্বিণীর বরদাস্ত হইল না, কাজেই কাদম্বিণী এই লইয়া হেমাঙ্গিণীর সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিলেন। হেমাঙ্গিণী সে ঝগড়া গায়ে পাতিয়া লইল না, দেখিয়া কাদম্বিণী মেজবউকে ছাড়িয়া দেবরটীকে পর্য্যন্ত বাক্যবাণ ছুড়িতে লাগিলেন। ক্রমে দিন পাঁচ ছয় পরে একদিন বৈকালে হেমাঙ্গিণীর স্বামী বিপিন বিরক্ত হইয়া বলিল, "কেষ্ট তোমার কে, যে একটা পরের ছেলে নিয়ে দিন-রাত আপনা আপনির মধ্যে লড়াই ক'রে বেড়াচ্ছ। আজ দেখলুম, দাদা পর্য্যন্ত ভারী রাগ করেছেন।" স্বামী স্ত্রীর এইরূপ বিবাদ হইবার পরই কেষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ হেমাঙ্গিণী কেষ্টকে বলিয়া উঠিলেন, "এখানে কি? কেন তুই রোজ রোজ আসিস বলত?" ভয়ে বিস্ময়ে কেষ্ট বলিল, "দেখ্‌তে এসেছি।" এই কথায় বিপিন হাসিয়া উঠিল; স্বামীর হাসিতে বিরক্ত হইয়া হেমাঙ্গিণী আজ কেষ্টকে বলিল. "আর এখানে তুই আসিস্‌নে, যা।"

কিন্তু কেষ্ট কি না আসিয়া থাকিতে পারে? হেমাঙ্গিণীর আবার দিন পাঁচ ছয় হইতে জ্বর হইয়াছে, সে জ্বর ছাড়ে নাই; শুনিয়া সন্ধ্যার সময় কেষ্ট তাহার মেজদিদিকে দেখিতে আসিয়াছিল কিন্তু তাহাকে আসিতে মেজদিদি নিষেধ করিয়া দিয়াছিল বলিয়া সে ভিতরে ঢুকিতে সাহস করে নাই। এমন সময় হেমাঙ্গিণীর পুত্র ললিত আসিয়া বলিল, "মা কেষ্ট মামাকে একবার আসতে দেবে? ঘরে ঢুকবে না—ঐ দোর গোড়া থেকে একটীবার তোমাকে দেখেই চলে যাবে।" এই প্রাণের টান দেখিয়া কি চোখের জল সম্বরণ করা যায়? হেমাঙ্গিণী তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল; সে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। মেজদিদি জিজ্ঞাসা করিল, "কান্না কেন?" কেষ্ট বলিল, "ডাক্তার বলে যে, বুকে সর্দ্দি বসেছে।" সেই দিন যাইবার সময় কেষ্ট বলিয়া গেল, "আমাদের গাঁয়ে বিশালাক্ষী ঠাকুর বড় জাগ্রত মেজদি, পূজা দিলে সব অসুখ বিসুখ সেরে যায়।—একটা টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দাও না মেজদি।" মেজদিদি বলিলেন "হ্যাঁরে কেষ্ট আমি তোর কেউ নই, তবে আমার জন্যে তোর এত মাথা ব্যাথা কেন?" এ প্রশ্নের উত্তর কেষ্ট কোথায় পাইবে? সে কি করিয়া বুঝিবে, যে, তাহার পীড়িত আর্ত্তহৃদয় দিবারাত্রি কাঁদিয়া তাহার মাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

পরদিন উমা আসিয়া হেমাঙ্গিণীকে খবর দিল, কা'ল তাগাদা না গিয়ে কেষ্ট হেমাঙ্গিণীর কাছে বসিয়াছিল বলিয়া, তাহার মার হ'য়েছিল—এমন মা'র যে নাক দিয়ে রক্ত পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু মার খাইয়াও কেষ্ট তাহার মেজদিদিকে আবার দেখিতে আসিয়াছিল, সেই দিন মেজদিদি মুখে বলিলেন, "দুর হ বলছি।" কিন্তু ভিতরে, তিনি তাহাকে বুকের আরও কাছে টানিয়া আনিবার জন্য চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। রাত্রিতে স্বামীকে বলিলেন, "কোনদিন ও তোমার কাছে কিছু চাইনি আজ এই অসুখের উপর একটা ভিক্ষা চাইছি দেবে?" স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাই!" হেমাঙ্গিণী উত্তর করিল, "কেষ্টকে আমাকে দাও।" স্বামীর কিছুতেই মত হইল না, অবশেষে হেমাঙ্গিণীর অভিমান-ক্ষুব্ধ অনেক কথার পর বলিলেন, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে।" কিন্তু তারপর এমন একটী ঘটনা ঘটিল, যে, হেমাঙ্গিণী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কেষ্ট কোথায় তাগাদা করিতে গিয়া তিনটা টাকা পাইয়াছিল; সেই টাকা তিনটা দিয়া মেজদিদির অসুখের জন্য কোন ঠাকুররের পূজা দিয়া একটা ঠোঙা করিয়া নির্ম্মাল্য ও সন্দেশ প্রসাদ মেজদিদি'র জন্য আনিয়াছে। ইহাতে

বড় বউ এমন কি বড় কর্ত্তা পর্য্যন্ত হেমাঙ্গিণীকে অপমান করিতে ছাড়িলেন না, তাঁহারা বলিলেন, হেমাঙ্গিণীই কেষ্টকে চুরী করিতে শিখাইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তারপর বড়কর্ত্তা কেষ্টকে এমন নির্দ্দয় ভাবে মারিলেন যে, বোধহয়, মানুষ মানুষকে তেমন ভাবে মরিতে পারে না। সেই দিন সবে হেমাঙ্গিণীর পথ্য করিবার কথা ; কিন্তু পাতের ভাত পাতেই শুকাইতে লাগিল। রাত্রিতে আজ আবার জ্বর আসিল, হেমাঙ্গিণী জ্বরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিল। রাত্রিতে সে স্বামীকে বলিল, "কেষ্টকে আশ্রয় দাও, নইলে এ জ্বর আমার সারবে না। মা দুর্গা আমাকে কিছুতে মাপ করবেন না।—দেবে ?" বিপিন সজল চক্ষু হাত দিয়া মুছাইয়া বলিলেন. "তুমি যা, চাও, তাই হবে ; তুমি ভাল হ'য়ে ওঠ।" কিন্তু হেমাঙ্গিণী ভাল হইয়া উঠিলেও যখন বিপিন কেষ্টকে আনিতে দিলেন না, তখন হেমাঙ্গিণী বলিয়া উঠিল, "আমার দুটী সন্তান ছিল, কাল থেকে তিনটী হ'য়েছে। আমি কেষ্টর মা।" এই বলিয়া 'কেষ্টর মা' হেমাঙ্গিণী বাপের বাড়ী যাইবার জন্য গাড়ী ডাকতে পাঠাইয়া, ছেঁড়া মাদুরে, গায়ের ব্যথার জ্বরে যেখানে কেষ্ট পড়িয়াছিল, সেই খানে গিয়া বলিল, "কেষ্ট, আয় আমার সঙ্গে, আমাকে বাপের বাড়ী আজ তোকে পৌঁছে দিতে হবে যে।" এই বলিয়া কেষ্টকে লইয়া তিনি গাড়ী চড়িয়া বসিলেন। যখন গাড়ী কিছুদূর চলিয়া গিয়াছে, তখন বিপিন ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে, মেজবৌ ?" "এ দের গ্রামে।" "কবে ফিরবে ?" হেমাঙ্গিণী কেষ্টকে দেখাইয়া বলিল, "কখনও এর আশ্রয় জোটে, তবেই ত একা ফিরে আসতে পারব, না হয়, একে নিয়েই থাকতে হবে।" হেমাঙ্গিণীর এই মাতৃমূর্ত্তি, তাহার এ মুখের ভাব দেখিয়া বিস্ময়ে বিপিনের কণ্ঠস্বর নম্র হইয়া আসিল, তিনি বলিলেন, "মাপ কর, মেজ বৌ, বাড়ী চল।" মেজ বৌ যখন বলিলেন, "কাজ না সেরে কিছুতেই বাড়ী ভিরতে পারবো না।" তখন, বিপিন কেষ্টর ডানহাত ধরিয়া বলিলেন, "কেষ্ট, তোর মেজদিদিকে তুই বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে আয় ভাই, আমি শপথ করছি, আমি বেঁচে থাকতে তোদের দুই ভাই-বোনকে আজ থেকে কেউ পৃথক করতে পারবে না।"

এই গল্পে শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, প্রেমের ক্ষেত্র কত অসীম। প্রকৃত প্রেম ও স্নেহ কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। স্বামীর চেয়েও যে কেহ বেশী আত্মীয় হইতে পারে, এই গল্পে শরৎচন্দ্র সেই তত্ত্বই দেখাইয়াছেন।

স্নেহ যখন দুয়ার ঠেলিয়া বহির হইতে চায়, তখন কিছুতেই তাহার পথ রোধ করিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

আবির্ভাব।

(শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়)

দুর্গম বন-কান্তার ছেদি' দুস্তর পথ হেলায় উত্তরিয়া
চক্রনেমির ঘর্ঘর রবে জগন্নাথের রথ এল বাহিরিয়া
অন্ধকারের যবনিকা ভেদি ছুটায়ে রুদ্ধ আলোর উৎস রাশি।
তরুণ অরুণ কিরণ প্রপাতে দিগ্বলয়ের জ্যোতি উঠে পরকাশি!
পার্থসারথি ধরেছে বল্গা তর্জ্জনী তুলি পথ নির্দ্দেশ করে'
অশ্বযুথের বিদ্যুৎ-বেগ, হ্রেষার উঠিল গগন পবন ভরে ;
আর্ত্তের তরে একি আহ্বান সঞ্চরি' উঠে প্রলয় অন্ধকারে
চঞ্চল আজি দুর্ব্বল প্রাণ. অর্গল কাঁপে নিষেধের কারাগারে ;
বিশ্বের মহারাজ
নিখিল মরণ শঙ্কা হরণ অভয় দানিছে আজ।
আজিকে শুভ্র শঙ্খ নিনাদে আহ্বান কার ভবনে ভুভনে রটে ?
এস বিশ্বের কল্যাণী নারী পূর্ণ করগো সব মঙ্গল ঘটে!
সিন্দুর লেপ, দাওগো এলোনা, আম্রশাখায় শুভের সূচনা কর
পূর্ণ কলসে শান্তির জল আপন কক্ষে আজি আনন্দে ধর!
এস হে মানব যজ্ঞশালায় হবিকাঠ দিয়ে জ্বালো জ্বালো হুতাশন,
বিশ্বের হিত সাধনার ব্রত অগ্নিমন্ত্রে কর আজ সমাপন!
মানুষ হইয়া মানুষের প্রতি কেমনে সহিবে এই হীন অপমান
দেখ চেয়ে দেখ আলয়ে তোমার নহে নিদ্রিত, জাগ্রত ভগবান!
জেগেছেন দয়াময়
নাহিক বিবাদ, নাহি অবসাদ নাহি নাহি আর ভয়!
জগন্নাথের রথ চলে যায়, সেকি কম্পন ত্রস্ত ধরণী বুকে
অর্দ্ধেক পথে থমকি সূর্য্য তুর্য্যনিনাদ শোনে সারথীর মুখে,

পবন আজিকে স্তব্ধ নিশানে পথ ছাড়ি' ভয়ে দূরে করে পলায়ন
রথ ঘর্ঘরে প্রতি ঘরে ঘরে চিরনিদ্রিত মেলিতেছে দুনয়ন !
অলস আজিকে ত্যজিছে শয্যা, অসাড় আজিকে দিয়ে ওঠে দেহ নাড়া
অন্ধ আজিকে দেখে চোখ মেলে, বধীর আজিকে আহ্বানে দেয় সাড়া
ওরে হতমান পীড়িত অধম বুকে বল করি দাঁড়া দেখি পুরোভাগে
ওরে প্রাণহীন চিরদিনহীন দেখ দেখ বুঝি ভগবান বুকে জাগে !
এসেছেন ব্যথাহারী
বুকের পাষাণ দূরে ছুড়ে ফেল বিশ্বের নরনারী !
নাহি কার্ম্মুক ভয়াল ভীষণ, তীক্ষ্ণ শাণিত যোদ্ধার তরবারী
নাহিক চক্র অমোঘ অস্ত্র, জেগেছেন আজ সকল বেদনাহারী,
বর্ম্মে বর্ম্মে নাহি সংঘাত, নিষ্ঠুরাঘাতে শস্ত্রের ঝনঝনি
পাঞ্চজন্যে যুদ্ধ ঘোষনা হবে না হবে না,অগ্নিশায়ক উঠিবে না রনরনি !
আজিকে হইবে পাশব দলন দীপ্ত আঁখির বজ্র চাহনি দিয়া
এক অঙ্গুলি হেলনে ত্রস্ত নিশ্চয় হবে নির্ভয় পাপ হিয়া !
অত্যাচারের খড়্গ খসিবে, অবিচারী রাজদণ্ড কাঁপিবে হাতে
ন্যায়ের মুকুট মুকুতাবিহীন দীনতার লাজে মলিন হইবে মাথে ;
আজিকে শক্তিময়,
নিরাশার ঘোর আঁধার মাঝারে দিতেছেন বরাভয় !
মানব-মানস কুরুক্ষেত্রে শত্রুমিত্রে হবে আজি মহারণ
সকল-স্বার্থে বিশ্ববাহিণী করিয়াছে আজ অটল মৃত্যুপণ ;
আজিকে পার্থ-স্বার্থের তরে আসে নাই রথে পার্থ-সারথি হরি
নিখিলের সব সম্পদ ভাগ তৌলদণ্ডে দিবে বণ্টন করি,
আজি বিশ্বের রাজাসন খানি স্থাপন করিবে বিশ্বকমল 'পরে
রাজসভাতলে হইবে বিচার হৃত অসহায় কাঙাল জনার তরে !
চরণ-নখর হইতে ক্ষরিবে মুক্তির ধূলি, ভিক্ষার ঝুলি দূরে করে
ফেলে দাও
তুমি নহ দীন সম্পদহীন নির্ভয়ে আজ নয়ন তুলিয়া চাও !
এসেছেন নারায়ণ
এস হে ভক্ত হৃদয়-রক্ত-কমল কর চরণ।

নারায়ণের পঞ্চ-প্রদীপ

সহজিয়া।

(শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট বি এল)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিপ্রলব্ধার কথা।

বাবা আমার নাম রেখেছিলেন জানকী। কিন্তু মা আমার সে নাম উল্টে দিয়ে রাখলেন উর্ম্মিলা, তবু ভাগ্য কি তাতে উল্টিয়েছে? জানকী নাম, বলে, রাখতে নেই, জন্ম দুঃখী হয়; কিন্তু উর্ম্মিলাই বা কি এত ভাল! মা জানকী ত' তবু তাঁর স্বামীর সঙ্গে চৌদ্দ বছর বনে বনে বনে কাটাতে পেয়েছিলেন, আমায় যে উর্ম্মিলার মত স্বামীকে পেয়েই হারাতে হয়েছে! মা আমার ভাগ্যটাকে যেন দিব্য চক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন তাই আগে থাকতেই নাম বদলে দিয়েছিলেন। তবু বাবা ডাকতেন, "মা জানকী," এবং আমিও উত্তর দিতাম। কারণ আর যে যাই মনে করুক, আমি আমার বাবাকে জনক ঋষির চেয়ে কম ভক্তি করতাম না, করতে শিখিও নি, এবং সেই জন্য নিজেরও জানকী হবার পক্ষে আপত্তিও তেমন ছিল না।

মাও যে বাবাকে কম ভক্তি করতেন তা নয়, তবু কেমন যেন তাঁর ভয় করত। আমায় সীতাদেবীর মত যে বাল্যকাল হতে শ্রীরামচন্দ্রের জন্যই উৎসর্গ করে রাখা হয়েছিল, এটা মা যেন সইতে পারতেন না। কেবলি ভয়ে ভয়ে থাকতেন। কাজে কর্ম্মে সব সময়ই আমাদের গৃহ-দেবতা রামসীতার চরণে তুলসী দিয়ে আমার বাবার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতেন।

কিন্তু বাবার শরীরে মনে কাজে কর্ম্মে কোথাও ভয়ের লেশ মাত্র ছিল না। উনি মাকে যখন তখন বুঝিয়ে দিতেন যে, "আমার জানকীর জন্য শ্রীরঘুনাথজী নিশ্চয়ই জন্মগ্রহণ করেছেন; তিনিই আমার মা জানকীকে পায়ে টেনে নেবেন।" মা শিউরে উঠতেন, কিন্তু আমার জ্ঞান হওয়ার পর হতে মনে পড়ে আমি কখনো ভয় পাই নি। আমি কত সময় দোতালার ছাতে উঠে আমাদের গ্রামের "সরান" পথটা যেখানে মাঠের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছে,

সেই দিকে চেয়ে আল্‌সে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। ভাবতাম আমার সেই রামচন্দ্র ধূলো উড়িয়ে পতাকা উড়িয়ে তাড়কা বধ করে কোন দিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হবেন।

বাবার এই ভাবটায় আমাদের যে কি রকম পেয়ে বসেছিল তা যে শুনবে সেই অবাক হয়ে যাবে। এমন কি বাড়ীর দারোয়ান ঘনবরণ সিং উৎসাহের চোটে একদিন নিজের নামটাই বদলে ফেলেছিল। ছিল ঘনবরণ, হয়ে গেল রামচরণ। আর এমনি তার হাড়ে হাড়ে রামভক্তি বিঁধে গিয়েছিল যে সে যা কিছু ছাপার অক্ষর সম্মুখে পেতো সবই রামপক্ষে ব্যাখ্যা না করে ছাড়ত না—এমন কি হনুমানজীর লেজটুকু পর্য্যন্ত বাদ যেত না। তার একদিনকার একটা ব্যাখ্যা আমার এখনো বেশ মনে পড়ে। কোথা হতে আমাদের গাড়োয়ান ছেদীলাল এক টুক্‌রো কাগজ নিয়ে এসে দারোয়ানজীকে ধরে বসলে, "দারোয়ানজী, ইঠোতো দেখিয়ে, ইসকো মৎলব তো বাৎলাইয়ে।"

দারোয়ানজী তাঁর তুলসীদাস হতে চোখ তুলে, কাগজ খানা হাতে নিলেন। তারপর প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বল্লেন, "আরে ইয়ে তো বাংলে হরফমে সংস্কৃৎ হায়—রামো লক্ষ্মণম ব্রবীৎ।"

"মতলব কেয়া?"

"রামো রামচন্দ্র রঘুনাথজী; লক্ষ্মণ, লছমনজী সমঝা?

"হাঁ মহারাজ, উ তো সমঝা, উসকে বাদ?"

"অব্রবী ইসকো মৎলব অলবৎ মা জানকী হোগা, আউর ওহি যে হলন্ত ত হায়নু, ওহি হায় মহাবীর জীকো দুম্ (লেজ)।"

আমাদেব দরোয়ানজীর ব্যাখার অসাধারণ ক্ষমতা আগে হতেই সবাই জানতো, তাই আমাদের কোন আত্মীয়ের মুখ হতে ক্রমশঃ পাঁচ হতে হতে শেষে বাবার কাণেও পৌঁছেছিল। আমরা চেপে চেপে হাসাহাসি করছিলাম বটে, কিন্তু বাবা দারোয়ানজীরই দিক নিয়ে বলেছিলেন, "ভক্তি করে যা মনে করবে তাই ঠিক হবে; তোমরা কেউ হেসো না।"

জোরে হাসবার কারো তেমন জো ছিল না, কারণ একে আমাদের বাড়ী হল গ্রামের জমিদার বাড়ী। তার ওপর এমনি একটা আচার অনুষ্ঠান পূজা পার্ব্বন, শাস্ত্র পাঠ, অতিথি সেবার হাওয়া সারা বৎসর ধরে বাড়ীতে বইত যে হাসি ঠাট্টা বাড়ী হতে প্রায় বিদায় নিয়েছিল। এমন কি যাত্রা গান কথকতা বা কীর্ত্তন যাই কিছু হোক না কেন, সমস্ত আনন্দের জিনিষের মধ্য

হাতে হাসির অংশটুকু বাদ না দিলে যেন আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে সে সবের স্থান হত না।

আমি জমিদারের মেয়ে, তাই চাকর দাসীরও অভাব ছিল না। কিন্তু বন্ধু বলতে যা বোঝায়, সখী বলতে যা বোঝায় তাত ছোট বেলা কৈ কখনো পাইনি। যাকেই অন্তরঙ্গ করতে গিয়েছি সেই যেন কেমন একটুখানি দূরত্ব রেখে তবে কাছে এসেছে। আমি যেন কোন একটা অচেনা জগতের জীব, কি এক অজানা কারণে, বোধ হয় শাপভ্রষ্ট হয়ে সংসারে এসেছি। আমার সঙ্গে ভাল করে, প্রাণ খুলে যেন মিশতে নেই! সবারই পক্ষে আমার কথা শুনতে আছে, কাজ বললে তৎক্ষণাৎ করে দিতে আছে, আমার ঘরে ধূপ ধূনো ফুল চন্দন সবই দিতে আছে, কেবল আমার গলা জড়িয়ে ধরে দুটো মানে-মৎলবহীন মিষ্টি কথা বলতে নেই।

এই জন্য আমার মধ্যে ছোটবেলা হতেই এমন একটা জীব জেগে উঠেছিল যা একেবারেই এ দেশের নয়, সে জন্তু কি দেবতা তা এখনো ঠিক করতে পারিনি সে কখনও চাইত ছুটে বেরিয়ে নেচে কুঁদে অস্থির হয়ে সব শুচিত্ব সব দূরত্ব দূর করে ফেলে দিতে, আবার কখনো চাইত একদম একলা চুপ চাপ অশোক বনের সীতার মত বসে থাকতে। আর এই দোটানার মাঝখানে যে মানুষটা সমস্ত দিনের কাজকর্ম্মের মধ্যে ঘুরে বেড়াত সে যে কি ছিল, তা আমি বলতে পারব না, তার না ছিল হাসি না ছিল কান্না, না ছিল মান না ছিল অপমান, না ছিল রাগ না ছিল অনুরাগ!

(২)

যাক্, এমনি করে কতদিন কেটে গেল! তারপর হঠাৎ এমন দুটী লোক আমাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল, তারা যেন একেবারে আলো আর অন্ধকারের মত আলাদা। একজনের নাম হাসি, আর একজনের ঠিক নাম কি জানিনে কিন্তু বাবা বল্লেন তিনি একজন ন্যাসী। আমরাও তাঁকে ন্যাসী মহারাজ বলেই ডাকতাম। একজন এল ফাগুনের দিনের মত একরাশ আলো আর হাসি আর রূপ, আর সাজসজ্জার অতিশয্যত্ব নিয়ে, অন্যজন এলেন বর্ষার অন্ধকার রাত্রের মত গাম্ভীর্য্য নিয়ে জটাজুট সমাযুক্ত হয়ে, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তের সর্ব্ব-রিক্ত মহাশয়ত্ব নিয়ে! আর আমি পড়ে গেলাম মহামুস্কিলে, কারণ এ দুজনার একজনকেও ঠেকিয়ে রাখবার জো ছিল না।

হাসি এসে আমার চাল চলন অসন বসন দেখে হেসেই অস্থির। আর

ন্যাসী মহারাজ আমার ঐ সমস্তই লক্ষ্য করে বল্লেন, যে, আমা হতে কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা হবেন। হাসি আমার পূজা অর্চ্চনা পড়া শুনার ধূম দেখে রেগে সমস্ত বৈ কাগজ পত্র পুড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা দিলে। আর ন্যাসী মহারাজ তাঁর ঝুলি হতে একখানা পরমহংস সংহিতা বার করে আমায় উপহার দিলেন। একই বস্তু দুজনে দু রকম চোখে দেখছেন দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার সেই আঠার বছরের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, বিচার শক্তি সমস্তই হঠাৎ কেমন থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল! অথচ দুজনের একজনকেও দূরে রাখতে পারলাম না। আমার চিরদিনকার শিক্ষা দীক্ষা যে সময় আমার ঐ ন্যাসী ঠাকুরের পায়ের কাছে বসিয়ে দিলে, ঠিক সেই সময়ই আমার অন্তরের অন্তরে যে মানুষটা ছিল সে যেন হাসির হাসির হাওয়ার মধ্যে ছুটে বেরিয়ে গেল। আমার কাণ দুটো, শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনত, মনও তাতে যে যোগ দেয় নি তা নয়, কিন্তু মনের যা মন তা যে হাসির দূর হতে টানাটানি অনুভব করছিল সেটা ত' মিথ্যে নয়।

এই হাসিটী ছিল আমার মামাত বোন। আমার মামা ক্রিশ্চান হয়ে গিয়েছেন বলে আমার দিদিমা তাঁর মাতৃহীনা নাতনীটীকে নিয়ে মামার কাছ থেকে পালিয়ে এখানে এসেছেন। তাঁর আশা বোধ হয় এই ছিল, যে আমাদের সংস্রবে এসে হাসি তার সমস্ত ক্রিশ্চানী শিক্ষা দীক্ষা হাব ভাব, বিশেষতঃ তার অকারণ হাসির উচ্ছ্বাস টুকু ভুলে প্যাঁচা হয়ে বসবে। কিন্তু ফলে হল, 'উল্টা বুঝলি রাম'। সে এসেই বাড়ি শুদ্ধ মাতিয়ে তুললে। মা তার সংস্রবে পড়ে পূজা পাঠের অবসরে ঘর দুয়ার সাজান ধোয়া মোছায় একটু বেশী মন দিলেন; ঝিয়েদের কাজ কর্ম্ম বাড়া সত্ত্বেও তারা মন খুলে গল্প গুজব লাগালে, আশ্রিত আশ্রিতারা একটু ভাল খাবার দাবার পেতে লাগল এবং তাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরে বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। অতিথশালায়ও শুনলাম নাকি খরচ আর কাজ বেড়ে গেছে। ঝাড়ুদার বেহারা হতে আরম্ভ করে বাগানের মালী পর্য্যন্ত একটা শোভনতা রক্ষার মধুর অত্যাচারে সর্ব্বদাই ব্যস্ত হয়ে ফিরতে আরম্ভ করলে। এমন কি বাবাও যেন ক্রমশঃ তাঁর কঠোর শুচিত্বের আবেষ্টনী হতে শোভন নির্ম্মলত্বের আবহাওয়ায় পড়ে স্বস্তি অনুভব করলেন, অন্ততঃ আমার ত তাই মনে হল।

ন্যাসী মহারাজ কিন্তু নিজের অগাধ গাম্ভীর্য্যের শিখরে অচল হয়ে বসে রইলেন। হাসি মাঝে মাঝে তাঁকেও নানা প্রকারে আক্রমণ করতে লাগল

কিন্তু তিনি এমনি একটা প্রশান্ত হাস্যে তার সকল প্রশ্ন তর্ক যুক্তিকে ঠেলে দিতে লাগলেন, যে, শেষে হাসি আর পারতপক্ষে তাঁর ত্রিসীমা মাড়াত না। ডাকলে বলত, "ওরকম হাজার বছরের আগেকার মানুষের কাছে গেলে অকারণে বুড়িয়ে যেতে হবে।"

আমি কিন্তু এই শান্ত গম্ভীর মানুষটীকে কিছুতেই বেশীক্ষণ ছেড়ে থাকতে পারতাম না, যখন তখন গিয়ে কাছে বসতাম, এটা ওটা এগিয়ে দিতাম, যখন তখন যা তা প্রশ্ন করে তাঁকে ভাবিয়ে তুলতাম, না হয় এমন একটা উত্তর নিয়ে আসতাম যা সমস্ত দিন ধরে আমায় পেয়ে বসে থাকত। বাবা যখন তাঁর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইতেন সেই সময়টা ছিল আমার সব চাইতে ভয়ঙ্কর সময়, কারণ সেই সময়টা আমায় উপস্থিত থাকতেই হ'ত—বাবার সেই রকম আদেশ ছিল। কিন্তু এই রকম বাধ্য হয়ে বসে থাকা বাধ্য হয়ে ধর্ম্ম কথা শোনা আমার যেন তেমন সইত না; তাই বাবা যখন থাকতেন না তখন যত ইচ্ছা এবং যেমন করে ইচ্ছা হত তেমনি করে ন্যাসী মহারাজের ঝুলিটা নেড়ে চেড়ে দেখতাম! এবং তাঁর সেই সময়ের অবাধ সঙ্গোপনভোগ হতে যা পেতাম তাই যেন প্রকৃত লাভ বলে মনে হত। মা দিদিমা বা অন্যান্য কোন সাধুসঙ্গলোলুপ আত্মীয়ের উপস্থিতিও যেমন এই অপূর্ব্ব মানুষটার ওপর একটা ভাব-গৈরিকের আচ্ছাদন ফেলত, তেমনি আমার সঙ্গেও অনেক সময় যেন তাঁর মনের উপরকার সেই প্রবীণত্বের গৈরিকটা টেনে ফেলে দিয়ে ভিতরকার চিরন্তন কিশোর মানুষকে টেনে বার করত।

এঁর বয়স যে কত হয়েছিল তা বলতে পারিনে। বাবা বলতেন সত্তর পঁচাত্তর হবে—কিন্তু কিছুদিনের পরিচয়ের পর আমার তা মনেই হত না। আমার মনে হত যেন তিনি আমারই বয়সী। তাঁর চিমটে, তাঁর ধুনি, তাঁর ছাই ভস্ম, তাঁর কটা গোঁফ জটা কিছুই যেন তাঁকে বুড়ো করতে পারেনি। অন্তরের খোলা মাঠে অবাধে ছুটে ছুটে খেলে বেড়িয়ে তিনি যেন অন্তরে চিরকিশোরই রয়ে গিয়েছিলেন। না ছিল তাঁর খাওয়া দাওয়ার ঠিক, না ছিল শোয়া বসার সময়। বেড়াচ্ছেন ত বেড়াচ্ছেনই—বসে আছেন ত বসেই আছেন, গল্প করছেন ত গল্পই করে যাচ্ছেন; আবার চুপ করে আছেন ত এমনি চুপ যেন জন্ম হতে চির-মৌন। তাঁর গল্পের সময়ও দেখিছি চারদিকের আকাশ বাতাসও যেন গল্প করত, গম্ভীর আওয়াজে মুখর হয়ে উঠত। আবার তিনি যখন মৌন হয়ে থাকতেন তখন যেন মনে হত জগতের মধ্যে আওয়াজ বলে

কোনো পদার্থই নেই। আমাদের গীত শাস্ত্রে নাকি বলে যে দিনের প্রত্যেক অংশের এক একটা প্রধান সুর আছে, এমন কি ষড় ঋতুরও এক একটা নিজস্ব সুর আছে। সেই সুর নাকি আমাদের গীত-বিশারদের কাণে ধরা পড়েছিল, তাই বিভিন্ন সময়ের জন্য এবং বিভিন্ন ঋতুর জন্য বিভিন্ন রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হয়েছিল। আমি অত শত বুঝি না, কিন্তু আমাদের ন্যাসী মহারাজ যখন যা করতেন বা বলতেন তার সমস্তই যেন সময়ের সঙ্গে স্থানের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খেয়ে যেত।

(৩)

কিন্তু হাসিরও আমার গুণ ছিল যে কত, তা বলে শেষ করতে পারি না। সে সারাদিন নানা কাজে ঘুরছে, কিন্তু দিনের শেষে দেখতাম একখানা এক-খানা চমৎকার ছবি তার ঘরের জানালার পাশে তৈরী হয়ে উঠেছে। কখন যে সে এত কাজ করে, ঘর সাজিয়ে, ছেলে পিলেদের খাইয়ে মুছিয়ে, রাজ্যের লোকের তত্ত্ব তল্লাস করে, এমন কি নানা রকম খাদ্য তৈরী করেও এই কলা-বিদ্যার সময় পেতো তাও ধরতে পারতাম না; কিন্তু এটা বেশ বুঝতে পার-তাম যে তার প্রাণের হাসিটুকু তুলির মুখে ছবির ভেতর অতি সহজেই ফুটে উঠ্‌ত আর তা সহজেই ধরা যেত। সে যা আঁকত তাতে কেবল থাকত আলো আর আলো শুধু রং আর রং। গাছ পালা, জীব জন্তু নদী সমুদ্র, পাহাড় পর্ব্বত, সব তাতেই একটা সজীব আলোর সমাবেশ। সবই যে প্রকৃতির হুবহু নকল তা নয়, হয়ত সবটাতেই রংএর একটু আতিশয্যই থাকত, তবু যেন ঐ সব সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি হতে তার মনের মানুষটাকে আমি ধরতে পারতাম।

একদিনকার কথা বেশ আমার মনে পড়ে। সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল, সমস্ত আকাশ যেন মেঘে একেবারে অন্ধকার, সম্মুখের দীঘীর জলও কালো হয়ে এসেছে, আম কাঁঠালের গাছের মধ্যে অন্ধকার জমে এসেছে কিন্তু আমি তার ঘরে গিয়ে দেখি যে সে ছবি আঁকচে। যদিও সেটা বরষারই ছবি বটে কিন্তু তাতে সে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নানারঙের আলো ফুটিয়ে তুলেছে, আর একটা হরিণশিশু মাথা উঁচু করে অস্তমান সূর্য্যকে দেখছে। গাছের সবুজ পাতাগুলোর ডগা লালে লাল আকাশে নীলের সঙ্গে লালের মেশামিশি, আর একটা রামধনুর এক অংশ ছবির কোণায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আমি বল্লাম "এ হতেই পারে না— রামধনু দেখা গেলে সূর্য্য দেখা যেতে পারে না।"

হাসি হেসে বল্লে,—"তা নাই বা গেল, তবু আমি তাই আঁকিব।"

এর ওপর তর্ক চলে না তাই তর্ক বন্ধ হল, কিন্তু আমার মনের মধ্যে তর্ক চলতেই লাগল। একবার মনে হল বলি, যে, যা অসম্ভব তা কিছুতেই সুন্দর নয়, আবার তখনি মনে হল, যে, যা সুন্দর তাকে যে সম্ভবের মধ্যে ধরা দিতেই হবে তার মানে কি? যে যে জিনিষ কেবল নিয়ম মেনে চলে তাকে সুন্দর করে তুলতে হলেই ত তার মধ্যে নিয়ম-ছাড়াকে সৃষ্টি-ছাড়াকে এনে ঢোকাতে হবে, নৈলে সৌন্দর্য্য যে কিছুতেই ফুটবে না। যা প্রত্যাশিতের মধ্যে অপ্রত্যাশিত তাই ত সুন্দর। যা নিয়মের মধ্যে অনিয়মিত তাই ত মনোমোহন।

হাসি তার ছবি থেকে মুখ তুলে একবার আমার দিকে চাইলে, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে তার তুলি দিয়ে আমার কপালে একটা টীপ পরিয়ে দিয়ে বল্লে, "এই দেখ এই ভুরু দুটোর মধ্যে যা ছিল না তাকে সৃষ্টি করে, প্রকৃতির নিয়মকে উল্টে দিয়ে তোমার কপালখানি কত সুন্দর করে দিলাম। চল দেখবে।

আমায় একখানা আয়নার সুমুখে দাঁড় করিয়ে সে এক মনে কি যে দেখলে তা সেই জানে, কিন্তু তার আদরের অপ্রত্যাশিত চুম্বনটুকু আমার প্রাণের মধ্যে এমন অপ্রত্যাশিতকে এনে দিলে যাকে নিয়ে আমি ঐ আয়না খানার সামনে অবাক হয়ে নিজের দিকেই চেয়ে রইলাম। আমার চেহারার মধ্যে কি যে দেখছিলাম ঠিক জানি না, কিন্তু কেবলি মনে হচ্ছিল এই ত আমি আমার কাছে ধরা দিয়েছি। আমার যে 'আমিটাকে' এত তত্ত্ব দিয়ে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারছিনে, এই ত আমার সেই 'আমি' একটী আনন্দে ভরা চুম্বনে সুন্দর হয়ে স্থূল হয়ে আলোক বাতাস মাটীর সমষ্টি হয়ে আপনারই কাছে ধরা দিয়েছি। এই দেহ হয়েই ত আমি আপনাকে পেয়েছি। আমি ত' অধর নই, আমি যে পূর্ণ ভাবে ধরা পড়ে গিয়েছি।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যার পর ন্যাসী মহারাজের কাছে গেলাম। কিন্তু দেখলাম তিনি চুপ করে বসে আছেন, আর বাবা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে বসে আছেন। ইতিপূর্ব্বে কি কথা যে হয়েছে তা জানিনে— কিন্তু দু'জনে চুপ করে বসে আছেন দেখে আমার যেন কেমন ভয় করতে লাগল। কোনো কথাই বলতে পারলাম না, ধীরে ধীরে এক পাশে বসে পড়লাম। ন্যাসী মহারাজ ফিরেও চাইলেন না, কোনো কথাও বল্লেন না;

কিন্তু বাবা একবার আমার দিকে চেয়েই আবার তাঁর দিকে দৃষ্টি ফিরালেন। তার পর হঠাৎ বল্লেন, "তা হলে কি করব!"

ন্যাসী বল্লেন "তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে যাও, তা হলেই তাঁকে পাবে—তিনি আপনি এসে দেখা দেবেন, কিন্তু এখানে বসে থাকলে হয়ত পাবে না।"

কার কথা হচ্ছিল, কাকে পেতে হবে, কিছুই বুঝতে না পেরে আমি অবাক হয়ে একবার এর পানে একবার ওর পানে তাকাতে লাগলাম। বাবাও কিছুক্ষণ বসে থেকে শেষে উঠে গেলেন।

আমি অবসর পেয়ে ভাবলাম একবার জিজ্ঞাসা করি, কার কথা হচ্ছিল; কিন্তু ন্যাসী মহারাজ তার অবসর দিলেন না। তিনিও হঠাৎ উঠে অন্ধকার বারান্দায় গিয়ে পায়চারী করতে লাগলেন। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে, শেষে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় শুনতে পেলাম ন্যাসী মহারাজ মৃদুস্বরে গান করছেন। তাঁকে কোনো দিন গান করতে শুনিনি, তাই হঠাৎ তাঁর মধুর গম্ভীর স্বর শুনে আমি চমকে উঠে, ধীরে ধীরে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

বাইরে একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছিল—আমি সেই বিদ্যুতের আলোকে দেখলাম ন্যাসী রেলিংএর উপর হাত রেখে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে গান গাইছেন। কি যে গাইছিলেন তা মনে নেই এবং বোধ হয় হিন্দি গান বলে বুঝতেও পারিনি, কিন্তু গানটার বিষয় এইটুকু মনে আছে যে যেন সেটা প্রতীক্ষার গান, কিম্বা বিরহের গানই হবে। তাই আমার কেবলি মনে হচ্ছিল যে এই এত বড় একটা আপ্তকাম পূর্ণকাম মানুষের মনের মধ্যে আবার এরকম করুণ সুরের উচ্ছ্বাস উঠল কেন?

তাঁকে অত্যন্ত অন্যমনস্ক দেখে আমি ফিরবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় তিনি কাছে এসে বল্লেন, "মা জানকি! তোমার জানকী নাম বদলে দিলাম, আজ হতে তুমি গৌরী; গৌরী হতে তোমার আপত্তি আছে?" আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইলাম; দেখলাম, তাঁর মুখে হাসির লেশ মাত্র নাই, তার পরিবর্ত্তে একটা ঔৎসুক্যের ভাব ফুটে উঠেছে। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে তিনি বল্লেন, "তোমাকে কি করতে হবে জান? একজন ঘরছাড়াকে ঘরে আনতে হবে,—গৌরী যেমন শ্মশানবাসী শিবকে গৃহবাসী মহাদেব করেছিলেন, তোমাকেও তেমনি একজনকে—কে সে জানিনে

একজন মহাত্যাগীকে মহাযোগী করতে হবে; এই কাজের জন্যই তুমি জন্মেছ, এইটীই তোমার এ জগতে জন্মাবার কারণ—বুঝেছ?"

আমি চুপ করে মাটীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ন্যাসী মহারাজ পায়চারী আরম্ভ করলেন। দু চারবার ঘুরে আবার কাছে এসে বল্লেন, "এইটাই তোমার অদৃষ্ট তুমি বোঝো, আর নাই বোঝ, মা, তোমা হতে এই কার্য্যই সিদ্ধ হবে। তোমার বাবাকেও তাই বুঝিয়েছি; আর তিনি আমার কথানুসারে কাজ কর্ব্বেন বলেছেন। তুমি গৌরী হতে পার্ব্বে না মা? একটী শিবকেও কি শব হতে না দিয়ে শঙ্কর করতে পারবে না?"

আমি কাতরভাবে বল্লাম, "কি করতে হবে বুঝিয়ে বলুন। যিনি ত্যাগী তিনি কি যোগী নন? যোগী তবে কে?"

"যিনি ত্যাগের দ্বারা ভোগ করেন, যিনি অনাসক্ত হয়ে আসক্ত হন, এবং যিনি আসক্ত হয়েও অনাসক্ত থাকেন তিনিই যোগী। যিনি বিয়োগী তিনি কি যোগী হতে পারেন? যিনি সর্ব্বকে সত্য বলে স্বীকার করে মিথ্যা বলে মায়া বলে উড়িয়ে না দিয়ে যোগ-যুক্তাত্মা হয়ে অবস্থিতি করেন তিনিই যোগী। অন্য সমস্ত যোগই এই যোগের প্রাথমিক অবস্থা। তোমায় এমনি একটী যোগীকে তৈরী করতে হবে—পারবে না মা?"

আমি বল্লাম, "আমি আপনার কথা বুঝতে তেমন পারলাম না, তবে এইটুকু বুঝলাম যে কোনো একজন সন্ন্যাসীকে গৃহী করতে হবে, তাঁর মুক্তির পথ বন্ধ করে বন্ধনের পথ করে দিতে হবে। তাই যদি আমার অদৃষ্ট হয়, তাই করব।"

ন্যাসী এইবার খুব জোরে হেসে উঠলেন—এত জোরে হাসতে তাঁকে কখনো শুনিনি। তিনি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে তাঁর আসনের উপর বসে বল্লেন, "মা মুক্ত না হলে কি পূর্ণরূপে বন্ধনের আনন্দ জানতে পারে? যে বদ্ধ জীব সে তো মুক্ত হবার জন্যই ছট ছট করছে, যে মুক্ত সেই পূর্ণ বন্ধনকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করতে পারবে। যাক এসব কথা আর এখন নয়, যখন সময় হবে আপনিই বুঝতে পারবে। যখন তোমার প্রকৃত গুরুকে পাবে, যিনি সহজেই তোমার সমস্ত বন্ধনের মধ্যে প্রবেশ করে তোমাকেও মুক্ত করবেন নিজেও আনন্দ পাবেন, তখন আনন্দ পাবে, তখন আমার আজকের কথা বুঝতে পারবে। এখন যাও কাল ভোরেই স্নান করে আমার কাছে এস।"

আমি ধীরে ধীরে ভিতরে চলে গেলাম। পরদিন প্রভাতে তাঁর কাছে

গিয়ে দেখলাম, তিনি হোম করছেন শুনিলাম রাত্রি হতে এই কার্য্য হচ্ছে। বাবা তাঁর কাছে বসে আছেন। কেন যে এই অনুষ্ঠান তা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে ন্যাসী নিজে আমায় ফোঁটা পরিয়ে দিলেন, শান্তিজল দিয়ে আশীর্ব্বাদী ফুল দিলেন। তার পর বাবার দিকে চেয়ে বল্লেন, "আমার কাজ শেষ হল, আজই আমি যাব। এর পর যা যা কর্ত্তব্য তুমিই করো। হয়তো আর দেখা হবে না কিন্তু আশা আছে, তোমার এই কন্যা হতে এমন একটা সত্য তুমি জানতে পারবে, যা তোমার কেন, অনেকেরই জানা নেই। কিন্তু তুমি না জেনেও সেই সত্যের জন্য নিজেও তৈরী হয়েছ এই কন্যাকেও তৈরী করেছ। তোমার চিরদিনকার আশার রামচন্দ্র আসবেন, এবং এমন ভাবে আসবেন যাতে সেই চিরন্তন গোপন সত্য তোমাদের উপলব্ধি হবে। মা জানকী! তোমায় এই টীকা পরিয়ে দিলাম, তুমি আজ হতে কেবল তাঁরই, যিনি কেবল তোমারি জন্য আসছেন, যিনি কেবল তোমারি। তোমারি হয়েই তিনি সবারই এবং সবারই হয়েই তিনি সর্ব্বাতীত।

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বাবা নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন, আমিও করলাম।

উপাসনা—অগ্রহায়ণ।

ছুঁৎমার্গ।

একবার এক ব্যঙ্গ-চিত্রে দেখিয়াছিলাম, ডাক্তার-বাবু রোগীর টিকি মূলে ষ্টেথিস্কোপ বসাইয়া জোর গ্রাম্ভারী চালে রোগ নির্ণয় করিতেছেন! আমাদের রাজনীতির দণ্ডমুণ্ড হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতার দলও আমাদের হিন্দু-মুসলমানের প্রাণের মিল না হওয়ার কারণ ধরিতে গিয়া ঠিক ঐ ডাক্তার বাবুর মতই ভুল করিতেছেন। আদত স্পন্দন যেখানে, যেখান হইতে প্রাণের গতি-রাগ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়, সেখানে ষ্টেথিস্কোপ না লাগাইয়া টিকি-মূলে যদি ব্যামো নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে তাহা যেমন হাস্যাস্পদ ও ব্যর্থ, রাজনীতির দিক দিয়া হিন্দু-মুসলমানে প্রাণের মিলনের চেষ্টা করাও তেমনি হাস্যাস্পদ ও ব্যর্থ। সত্যিকার মিলন আর স্বার্থের মিলনে আসমান জমিন তফাৎ। প্রাণে প্রাণে পরিচয় হইয়া যখন দুইটি প্রাণ মানুষের-গড়া সমস্ত বাজে

বন্ধনের ভয়-ভীতি দূরে সরাইয়া সহজ সঙ্কোচে মিশিতে পারে, তখনই সে মিলন সত্যিকার হয়; আর যে মিলন সত্যিকার, তাহা চিরস্থায়ী, চিরন্তন। কোন একটা বিশেষ কার্য্য উদ্ধারের জন্য চির-পোষিত মনোমালিন্যটাকে আড়াল করিয়া বাহিরে প্রাণভরা বন্ধুত্বের ভান করিলে সে বন্ধুত্ব স্থায়ী তো হইবেই না, অপরন্তু সে স্বার্থও সিদ্ধ না হইতে পারে, কেননা মিথ্যার উপর ভিত্তি করিয়া কখনও কোন কার্য্যে পূর্ণ সাফল্য লাভ হয় না।

এখন কথা হইতেছে যে আদতে রোগ কোথায়? আমাদের গভীর বিশ্বাস যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রধান অন্তরায় হইতেছে এই ছোঁয়া-ছুঁয়ির জঘন্য ব্যাপারটাই। ইহা যে কোন ধর্ম্মেরই অঙ্গ হইতে পারে না, তাহা কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকিলেও আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। কেননা একটা ধর্ম্ম কখনো এত সঙ্কীর্ণ অনুদার হইতেই পারে না। ধর্ম্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য চিরদিনই বিশ্বের সকলের কাছে সমান সত্য। এইখানেই বুঝা যায় যে, কোন ধর্ম্ম শুধু কোন এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নয়, তাহা বিশ্বের। আর এই ছুঁৎমার্গ যখন ধর্ম্মের অঙ্গ নয় তখন নিশ্চয়ই ইহা মানুষের সৃষ্টি বা খোদার উপর খোদকারী। মানুষের সৃষ্টি শৃঙ্খলা বা সমাজবন্ধন সাময়িক সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা তো শাশ্বত সত্য হইতে পারে না। এই জন্যই "সম্ভবামি যুগে যুগে"-রূপ মহাবাণীর উৎপত্তি। আমাদেরও "হাদিসে" সেইজন্য প্রতি-শত-বর্ষে একজন করিয়া "মুজাদ্দাদ" বা সংস্কারক আসেন বলিয়া লিখিত আছে। "বেদাৎ" বা মানুষের সৃষ্ট রীতিনীতির সংস্কার করাই এই সংস্কারক-দের মহান লক্ষ্য। হিন্দু-ধর্ম্মের মধ্যে এই ছুঁৎমার্গরূপ কুষ্ঠরোগ যে কখন্ প্রবেশ করিল তাহা জানিনা, কিন্তু ইহা যে আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃদের মত একটা বিরাট জাতির অস্থিমজ্জায় ঘুণ ধরাইয়া একেবারে নির্ব্বীর্য্য করিয়া তুলিয়াছে, তাহা আমরা ভাই-এর অধিকারের জোরে জোর করিয়া বলিতে পারি। আমরা যে তাঁদের সমস্ত সামাজিক শাসনবিধি একদিনেই উল্‌টাইয়া ফেলিতে বলিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু যে-সত্য হয়ত একদিন সামাজিক শাসনের জন্যই শৃঙ্খলিত হইয়াছিল, তাহার কি আর মুক্তি হইবে না? বাঙ্‌লার মহাপ্রাণ মহাতেজস্বী পুত্র স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, ভারতে যেদিন হইতে এই "ম্লেচ্ছ" শব্দটার উৎপত্তি সেইদিন হইতেই ভারতের পতন, মুসলমান আগমনে নয়। মানুষকে এত ঘৃণা করিতে শিখায় যে ধর্ম্ম, তাহা আর যাহাই হউক ধর্ম্ম নয়, ইহা আমরা চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিতে পারি। এই ধর্ম্মেই নরকে

নারায়ণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কি উদার সুন্দর কথা! মানুষের প্রতি কি মহান্ পবিত্র পূজা! আবার সেই ধর্ম্মেরই সমাজে মানুষকে কুকুরের চেয়েও ঘৃণ্য মনে করিবার মত হেয় জঘন্য এই ছুৎমার্গ বিধি! কি ভীষণ অসামঞ্জস্য! আমাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত দহন—পূত কালাপাহাড়ের দলকে সেইজন্য আমরা আজ প্রাণ হইতে আবাহন করিতেছি এই মান্ধাতার আমলের বিশ্রী বিধি-বন্ধন ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতে,—"আয়রে নবীন, আয়রে আমার কাঁচা!" আমরা যে ধর্ম্মটাকেই একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহিতেছি, ইহা মনে করিলে আমাদের ভুল বুঝা হইবে। আমরা অন্তর হইতেই বলিতেছি যে, আমাদিগকে সীমার মাঝে থাকিয়াই অসীমের সুর বাজাইতে হইবে। নিজের ধর্ম্মকে মানিয়া লইয়া সকলকে প্রাণ হইতে দু-বাহু বাড়াইয়া আলিঙ্গন করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। যিনি সত্যিকার ভাবে স্বধর্ম্মে নিষ্ঠ, তাঁহার এই উদার বিশ্বপ্রেম আপনা হইতেই আসে। যত ছোঁওয়া-ছুঁয়ির নীচ ব্যবহার ভণ্ড বক-ধার্ম্মিক আর বিড়াল-তপস্বী দলের মধ্যেই। ইহাদের এই মিথ্যা মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া ইহাদের অন্তরের বীভৎস নগ্নতা সমাজের চোখের সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে হইবে। এইখানে একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল। একদিন আমরা এক ট্রেণে গিয়া উঠিলাম। আমাদের কামরায় মালা-চন্দন-ধারী অনেকগুলি হিন্দু ভদ্রলোক ছিলেন। আমরা কামরায় প্রবেশ করিবামাত্র অর্থাৎ আমাদের মাথায় টুপী ও পগ্‌গ দেখিয়াই ছোঁওয়া যাইবার ভয়ে তাঁহারা তটস্থ হইয়া অন্য দিকে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই বেঞ্চেরই এক প্রান্তে বসিয়া এক পণ্ডিতজি বেদ বা ঐরূপ কোন শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিয়া ঐ ভদ্রলোকেদের শুনাইতেছিলেন। তিনি আমাদের দেখিয়াই এবং আমাদের অপ্রতিভ ভাব দেখিয়া হাসিয়া আমাদের হাত ধরিয়া সাদরে নিজের পার্শ্বে বসাইলেন। ভদ্রলোকদের চক্ষু ততক্ষণে কাণ্ড দেখিয়া চড়ক গাছ! আমরাও তখন সহজ হইয়া পণ্ডিতজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি পণ্ডিত ও আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-কুলতিলক হইয়াও কি করিয়া আমাদিগকে এমন করিয়া আলিঙ্গন করিতে পারিলেন, অথচ এই ভদ্রলোকগণ আমাদিগকে দেখিয়াই একেবারে দশহাত লাফাইয়া উঠিলেন? ইহাতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "দেখ বাবা, আমি হিন্দু-ধর্ম্মকে ভালবাসি ও সত্য বলিয়া জানি বলিয়াই বিশ্বের সকলকে সকল ধর্ম্মকে ভালো বাসিতে শিখিয়াছি। আমার নিজের ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস আছে বলিয়াই অন্য সকলকে বিশ্বাস করিবার ও প্রাণ দিয়া

আলিঙ্গন করিবারও শক্তি আমার আছে। যাহারা অন্য ধর্ম্মকে ও অন্য মানুষকে ঘৃণা করে বা নীচ ভাবে, তাহারা নিজেই অন্তরে নীচ, তাহাদের নিজেরও কোন ধর্ম্ম নাই। তবে ধর্ম্মের যে ঘটাটা দেখ, তাহা অন্তরের দীনতা ঢাকিবারই ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র!" ইহা বনানো গল্প নয়, সত্য ঘটনা। মানুষ হইয়া মানুষকে কুকুর বিড়ালের মত এত ঘৃণা করা—মনুষ্যত্বের ও আত্মার অবমাননা করা নয় কি? আত্মাকে ঘৃণা করা আর পরমাত্মাকে ঘৃণা করা একই কথা। সেদিন নারায়ণের পূজারী বলিয়াছিলেন, 'ভাই, তোমার সে পরম দিশারী তো হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়, সে যে মানুষ!" কি সুন্দর বুকভরা বাণী! এ যে নিখিল-কণ্ঠের সত্য-বাণীর মূর্ত্ত প্রতিধ্বনি! যাঁহার অন্তর হইতে এই উদ্বোধন বাণী নির্গত হইয়া বিশ্বের পিষ্ট ঘৃণাহত ব্যথিতদের রক্তে রক্তে পরম শান্তির সুধা ধারা ছড়াইয়া দেয়, তিনি মহা-ঋষি, তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার! যদি সত্যিকার মিলন আনিতে চাও ভাই, তবে ডাক ডাক, এমনি করিয়া প্রাণের ডাক ডাক। দেখিবে দিকে দিকে অবহেলিত জন-সঙ্ঘ তোমার এই জাগ্রত মহা-আহ্বানে বিপুল সাড়া দিয়া ছুটিয়া আসিবে। যাহারা স্বার্থপর, তাহারা মাথা কুটিয়া মরিলেও তো প্রাণের সাড়া কোথাও পাইবেনা, যাহাকে পাইয়া তাহারা উল্লাসে নৃত্য করিবে তাহা বাহিরের লৌকিক "ডিটো" দিয়া মাত্র। অন্তরের ডাক মহা-ডাক, ডাকিতে হইলে প্রথমে বেদনায়—একেবারে প্রাণের আর্ত্ততারে গিয়া এমনি করিয়া ছোঁওয়া দিতে হইবে। আর তবেই ভারতে আবার নূতন সৃষ্টি জাগিয়া উঠিবে। হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগগন-তলের সীমা-হারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া মানব! তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম-বাণী ফুটাও দেখি! বল দেখি, "আমার মানুষ ধর্ম্ম!" দেখিবে, দশদিকে সার্ব্বভৌমিক সাড়ার আকুল স্পন্দন কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই উপেক্ষিত জন-সঙ্ঘকে বুক দাও দেখি, দেখিবে এই স্নেহের ঈষৎ পরশ পাওয়ার গৌরবে তাহাদের মাঝে ত্যাগের একটা কি বিপুল আকাঙ্ক্ষা জাগে! এই অভিমানীদিগকে বুক দিয়া ভাই বলিয়া পাশে দাঁড় করাইতে পারিলেই ভারতে মহা জাতির সৃষ্টি হইবে, নতুবা নয়। মানবতার এই মহা-যুগে একবার গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বল যে, তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও, হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ তুমি সত্য। মহাত্মা গান্ধীজি ধরিয়াছেন এই মহা সত্যকে,

তাই আজ বিক্ষুব্ধ জনসঙ্ঘ তাঁহাকে ঘিরিয়া এমন আনন্দের নাচ-নাচিতেছে। তোমরা রাজনীতিক যুক্তি-তর্কের চটক দেখাইয়া লেখাপড়া-শেখা ভণ্ডদের মুগ্ধ করিতে পার, কিন্তু অমন ডাকটি আর ডাকিতে পারিবেনা। আমরা বলি কি, সর্ব্বপ্রথমে আমাদের মধ্য হইতে এই ছুঁৎমার্গটাকে দূর কর দেখি, দেখিবে তোমার সকল সাধনা একদিনে সফলতার পুষ্পে পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। হিন্দু মুসলমানকে ছুঁইলে তাঁহাকে স্নান করিতে হইবে, মুসলমান তাঁহার খাবার ছুঁইয়া দিলে তাহা তখনই অপবিত্র হইয়া যাইবে, তাহার ঘরের যেখানে মুসলমান গিয়া পা দিবে সেস্থান গোবর দিয়া (!) পবিত্র করিতে হইবে, তিনি যে আসনে বসিয়া হুঁকা খাইতেছেন, মুসলমান সে আসন ছুঁইলে তখনই হুঁকার জলটা ফেলিয়া দিতে হইবে,— মনুষ্যত্বের কি বিপুল অবমাননা! হিংসা, দ্বেষ, জাতিগত রেষারেষির কি সাংঘাতিক বীজ রোপণ করিতেছ তোমরা! অথচ মঞ্চে দাঁড়াইয়া বলিতেছ, "ভাই মুসলমান এস, ভাই ভাই এক ঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই!" কি ভীষণ প্রতারণা! মিথ্যার কি বিশ্রী মোহজাল! এই দিয়া তুমি একটা অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিবে? শুনিয়া শুধু হাসি পায়। এসো, যদি পার তোমার স্বধর্ম্মে প্রাণ হইতে নিষ্ঠা রাখিয়া আকাশের মত উদার অসীম প্রাণ লইয়া এসো! এসো তোমার সমস্ত সামাজিক বাধাবিঘ্ন দু'পায় দলিয়া মানুষের মত উচ্চ-শিরে তোমার মুক্ত-বিথার নাঙ্গা মনুষ্যত্ব লইয়া। এসো, মানুষের বিরাট বিপুল বক্ষঃ লইয়া। সে মহা-আহ্বানে দেখিবে আমরা হিন্দুমুসমান ভুলিয়া যাইব। আমাদের এই তরুণের দল লইয়া আমরা আজ কালাপাহাড়ের দল সৃষ্টি করিব। আমরাই ভারতে আবার অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিব। যে রক্ষণশীল বৃদ্ধ এতটুকু "টু" করিবে, তাহার গর্দ্দান ধরিয়া এই মুক্তির দিনে বাহির করিয়া দাও। যে আমাদের পথে দাঁড়াইবে, তাহার টুঁটি টিপিয়া মারিয়া ফেল। শুধু মানুষ বাঁচিয়া থাক ভাই,— ভারতে শুধু চিরকিশোর মানুষেরই জয় হউক!

নবযুগ

নারায়ণের নিকষ-মণি।

দুনিয়ার দেনা।

"দুনিয়ার দেনা" এক খানি গল্পের সাজি। এতে সাতটি গল্প আছে— বোঝা বওয়া, ফকিরের ফাঁক, দশের দোসর, পথের মানুষ, কাপালিকের কপাল, সাঁঝের পাঁড়ি ও দুনিয়ার দেনা। বই খানি শ্রীমতী হেমলতা দেবীর লেখা।

হেমলতার লেখনী অমৃত মাখা। মেয়ের লেখা প্রায়ই ফিকে হয়, আমাদের দেশে তাদের জীবনও যেমন সাত গণ্ডীর কোণে গড়া রিক্ত নিঃসম্বল, তাদের লেখাও তেমনি দু দশটা কুড়িয়ে পাওয়া ভাবের হালকা ফেনায় ভরা। কিন্তু হেমলতার লেখায় ঋষির সাধনা ও দৃষ্টিখানি নারীর শুচিতায় কি যে অপূর্ব্ব বস্তু হয়ে উঠেছে তা' বলে বোঝাবার নয়।

'বোঝা বওয়া' গল্পটির মধ্যে থেকে একটু খানি নমুনা দিই—"তখন আমি বুঝলুম ব্যাপারটা কি? বল্লুম, 'মহারাজ, আমার ও কাজ করে বেতন নেবার যো নাই' আমি যে আমার ভক্তির আজ্ঞায় কাজ করে থাকি। বেতন নিলেই আমি মারা পড়বো।"

রাজা বল্লেন, "তবে তুমি বিনা বেতনেই আমার কোন একটা কাজ কর।"

"তাই হবে মহারাজ, কাল থেকে আমি প্রতিদিন আপনার দরবারের বড় দরজায় উপস্থিত থাকবো, যে কেউ রাজ দর্শনে আসবে তার সঙ্গে যদি কোন বোঝা থাকে তাই নামিয়ে নেওয়ার ভার আমার উপর রইল। আপনি যখন আমাকে নিজের মধ্যেই আটকে রাখতে চাইছেন তখন এই বাঁধার মধ্যে আমার ঐটুকু ফাঁক, ঐ বোঝা নামান টুকু দেখাতেই আমার আনন্দ।"

সেই থেকে যে আসে দরবারে তার বোঝা নামাই। এতে আমার শ্রান্তি নেই. ক্লান্তি নেই, শুধু কেবল তৃপ্তিই আছে।"

তাহার পর এ দরবারী বোঝা নামানর বাঁধা নিয়মও তার সইল না।

"আমি কিন্তু সেই দিন থেকে তাঁর রাজদরবারের বড় দরজার সামনে হাজির থাকবার বাঁধা নিয়ম থেকে অব্যাহতি পেয়েছি। এখন আমি নিজের ইচ্ছামত রাজ দরবারের দরজায় গিয়ে দরবারী লোকের বোঝা নামাই, কখনো

রাস্তার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে সাধারণ পথিকদের বোঝা বই—যেমন আমার খুসী।"

নিজের আনন্দ সৃজনের বোঝা বয়ে মেয়ে-কবি হেমলতা তাঁর—"দেনা আমার দেনা, বেজায় আমার দেনা, দেনা আমার সবার কাছে"—সেই ঋণ যে ভাবে শোধ করেছেন, তা অক্ষয় কবচ হয়ে বাংলার সারদার আঁচলে বাঁধা থাকবে।

পল্লী ব্যথা।

পল্লীব্যথা কবিতার বই, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এই মালার মালাকর, মালার এক ছড়ার দাম ১৲ টাকা।

পল্লীব্যথা পল্লীর অযত্নকণ্টকিত বিজন পথের ঝরা ফুল, এ ভাবের কবিতা নয়—প্রাণের কবিতা। রবীন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্রে যে ব্যবধান তাহা ধরিতে গেলে, এক স্থানে পাই ভাবের মগ্ন-সমাধি-কল্পনার কারুময় মর্ম্মর-স্বপ্ন; আর অপর স্থানে হেমচন্দ্রে পাই প্রাণের তর-তরে গঙ্গা,—হৃদয়-আঙ্গিনার ভরা সঙ্কীর্ত্তন। সাবিত্রীর কবিতায় ঘরের আলপনা আছে, "বাঁশের খুঁটি তাতে খানিক কোষ্টা বাঁধা" গ্রাম্য ছবি আছে, "কনে-চন্দনের উৎসব মঙ্গল স্নিগ্ধতা আছে,

"পিঁড়ে আমার নেপা পোঁছা সিঁদূর প'লে যায়গো তোলা
বাতায় গোঁজা দুলছে দেখো খোকামণির সোনার দোলা।"

পল্লীর শ্যামসজল কুঞ্জ মধুর প্রাণের দেবতা যদি রূপ ধরে তবে সে ত পল্লী বধু হইয়া—

"তাদের সকল পুণ্য ধর্ম্ম ছড়িয়ে আছে ঘাটে বাটে,'

* * * *

"তাদের হিয়ার ধৈর্য্য স্নেহ চিরদিনই অচঞ্চল।"

* * * *

"সিক্তবসনে হিন্দুনারী যে নিত্য ঘাটের কূলে
ধারা জল ঢালে আনত আননে অশথ-বটের মূলে,
ছোঁয়াইয়া মাটি শিরে
নিজ ঘরে যায় ফিরে,
তোমরা বলিবে "অন্ধ এ প্রথা তোমাদেরই ভাল সাজে
তুচ্ছ গাছও পাথরের পূজা দেখে মরে যাই লাজে।

উজাড়িয়া ভরা ঝারি
ঢালে পবিত্র বারি
সে যে রমণীর অপূর্ণ সাধ পূর্ণ কলসে রয়
পুণ্যপরশে তীর্থ-সলিল চির গৌরবময়"

এই পল্লী-দেবীর দেউল আজ উৎসবহীন, দেশ মরিয়াছে—তাই আজ দেশাত্মা রূপহারা। সে বেদনাও পল্লীব্যথায় করুণ হইয়া বাজিয়াছে—

"সন্ধ্যাবেলায় তুলসী তলায় জ্বলে না প্রদীপখানি।"

সাবিত্রীর হৃদয়খানি নারীর হৃদয়, কোমল বেদনায় সে যখন তুলি ধরে, তখন বর্ণে বর্ণে নারীত্বকে প্রাণ দেয়। হৃদয়ের যত কোমল বৃত্তি—করুণ ও কান্ত-রস স্নেহগলা হইয়া সাবিত্রীর কবিতায় প্রাণ পায়। এ কবি ভুলিয়া পুরুষ হইয়াছিল—অন্য ভাবের কবিতা লিখিতে গিয়া আমার মনে হয় সাবিত্রী এমন সফল হয় নাই।

সংক্ষিপ্ত পুস্তক পরিচয়।

রামমোহন রায় ও হিন্দুধর্ম্ম—শ্রীসুকুমার হালদার প্রণীত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সামলং ফার্ম, রাঁচি হইতে প্রকাশিত। মূল্যের উল্লেখ নাই।

এই ৪০ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানির মধ্যে জানিবার ও ভাবিবার অনেক বিষয় আছে। রামমোহন রায় সম্বন্ধে আমাদের তথা-কথিত শিক্ষিত সমাজের জ্ঞান এত সঙ্কীর্ণ যে তাঁহার সম্বন্ধে কতকগুলা শোনা কথাই সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত 'ব্রহ্ম সভার' স্বরূপ কি, তাহা হইতে কিরূপে বর্ত্তমান ব্রহ্মসমাজ উদ্ভূত হইল, এবং ব্রহ্ম-সমাজ হিন্দু-সাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রভাব কেন বিস্তার করিতে পারিল না—তাহা এই পুস্তিকায় সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। পুস্তিকাখানি ইংরাজীতে লিখিত না হইয়া বাঙলায় লিখিত হইলে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য আরও সফল হইত।

পাশ্চাত্যধর্ম্ম ও বর্ত্তমান সভ্যতা—সুকুমার হালদার প্রণীত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক রাঁচি সামলং ফার্ম হইতে প্রকাশিত।

ইউরোপীয়েরা বিশেষতঃ পাদরীরা অনেক সময় বলিয়া থাকেন যে তাঁহাদের বর্ত্তমান সভ্যতা ও আধিপত্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মেরই ফলস্বরূপ। লেখক

ইতিহাস হইতে বহুবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইউরোপীয় জাতি সমূহের উন্নতি উহাদের কার্য্যক্ষমতা ও কার্য্যকুশলতার ফলেই ঘটিয়াছে, তাহার সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বড় একটা সম্বন্ধ নাই। বরং এ কথাই সত্য যে শিক্ষার বিস্তার বা সামাজিক বিষয়ে উদারতর মতবাদ প্রচার সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রতিপাদে বাধা দিয়াই আসিয়াছে। পুস্তকখানি সুচিন্তিত ও সুলিখিত।

নাটক ও নাটকের অভিনয়—৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ১০৬।৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইতে শ্রীঅবনিনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—

পুস্তক খানি প্রধানতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'ভ্রান্তি বিলাস' ও দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' অবলম্বন করিয়া নাটক ও নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা। প্রবন্ধগুলি বহুপূর্ব্বে এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর আমাদের দেশে নাটক ও অভিনয়ের অনেক উন্নতি হইয়াছে কিন্তু অনেক গুলি কথা বর্ত্তমান কালের অনিভয় সম্বন্ধে ও বেশ খাটে। "নাটকের রচিত পাত্রের প্রকৃতি বুঝিতে না পারিলে অথবা বুঝিবার ত্রুটি থাকিলে অভিনয় না হইয়া যাত্রা হইয়া পড়ে। এক্ষণে আমাদের দেশে যে সকল অভিনয় হইতেছে তাহার মধ্যে এই ত্রুটীই সর্ব্বপেক্ষা অধিক।"

অভিনেতৃগণ পুস্তক খানি একবার পড়িয়া দেখিলে উপকৃত হইবেন।